# দুইঢেউ একনদী

বুদ্ধদেব বসু

উজ্জ্বল সাহিত্য মন্দির

শোভন মুদ্রণ ঃ
জানুয়ারী, ১৯৫৯

প্রতিষ্ঠাতা ঃ
শরৎচন্দ্র পাল
কিরীটিকুমার পাল

প্রকাশিকা ঃ
সুপ্রিয়া পাল
উজ্জ্বল সাহিত্য-মন্দির
সি-৩, কলেজ স্ট্রীট মার্কেট
কলিকাতা-৭ ( দ্বিতলে )

মুদ্রাকর ঃ
গৌরমোহন বাকুলী
নারায়ণ প্রিন্টার্স
১এ, গোঁসাই লেন
কলিকাতা-৩

প্রচ্ছদ ঃ
অমিয় ভট্টাচার্য

বুদ্ধদেব বসু, এমনই একজন বিরল শ্রেণীর লেখক, যাঁর লেখাতে সৃষ্টি হয় আভিজাত্যের রূপ। শুধুমাত্র তাঁর লেখনীতেই একমাত্র ভাষার জগৎ খুঁজে পাওয়া যায়। যেমন তার অসাধারণ নিবন্ধ, অনন্য কবিতা, অবিস্মরণীয় উপন্যাস, তেমনি কাব্যনাটিকা। তাঁর এই 'দুই ঢেউ এক নদী' বইটি একটি অনন্য উপন্যাস। তাই পাঠক-পাঠিকাদের কথা স্মরণ রেখে আমরা বইটিকে সুলভ মূল্যে প্রকাশ করলাম। আশা করি, আমাদের এই প্রচেষ্টা সার্থক হবে। বিনীত—

প্রকাশক

'দুই ঢেউ এক নদী' 'পারিবারিক' উপন্যাসের পরিমার্জিত সংস্করণ। উপন্যাসটি প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৩৬-এ।

বু. ব.

দোতালার রাস্তার ধারে জানলায় ব'সে টুনকি বিকালের দিকে তার ছোটো-ছোটো ধারালো দাঁত নিয়ে একটা কাঁচা পেয়ারা ঠুকরে খাচ্ছিলো, এমন সময় তার মনে হ'লো তাদেরই বাড়ির দরজায় একটা ঘোড়ার গাড়ি এসে থামলো। দাঁতের ক্রিয়া তখনকার মতো স্থগিত রেখে টুনকি ঘাড় উঁচু ক'রে তাকিয়ে—আরে, তা-ই তো। কে এলো? এক মুহূর্ত ভাবতে চেষ্টা করলো, কে! কিন্তু তার পরেই গাড়ির দরজা খুলে যে-লোকটি নামলো, তার উপর চোখ পড়ামাত্র ধুপ্ ক'রে নামলো টুনকি জানলা থেকে এক লাফে বাইরে।

—'দাদা এসেছেন, দাদা।'

দুম্‌দাম্ ক'রে নামলো সে সিঁড়ি দিয়ে, সামনের আঙিনাটুকু পার হ'য়ে একেবারে রাস্তায়। সুমন্ত্র ততক্ষণে নিজের হাতেই তার বিছানা-বাক্স নামিয়েছে, চুকিয়ে দিচ্ছে গাড়োয়ানের পাওনা।

'মোটে এক টাকা বাবু?'

'আবার কত?'

'পক্ষীরাজ ঘোড়া ছুটাইয়া আনলাম।'

সুমন্ত্র মুচকি হাসলো। 'আচ্ছা, নাও তবে,' ব'লে আর-একটা টাকা দিলে। গোলাপী গেঞ্জি-পরা গাড়োয়ান দাঁত বের ক'রে হাসলো একবার, তারপর লাগামে টান দিয়ে জিহ্বা ও তালুর সাহায্যে তাদের চির-অভস্ত শব্দটা করলে, বর্ণমালার চিহ্নে যেটা প্রকাশ করা দুঃসাধ্য। ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে গাড়ি চ'লে গেলো।

টুনকি একটু দূরে দাঁড়িয়ে দেখছিল, এইবার কাছে এসে সলজ্জভাবে বললো, 'কি করলে দাদা, একেবারে দু'টাকা দিয়ে দিলে!'

'কেন, বেশী দিয়েছি নাকি?'

'বেশী না!' ঝাঁকড়া চুল দুলিয়ে টুনকি ব'লে উঠলো, 'আজকাল স্টেশন থেকে এক টাকায় আসে যে!'

'তা-ই নাকি?'

সুমন্ত্র আর-কিছু না-বলে তার বাক্স-বিছানা তুলে নিলো। টুনকি ব্যস্ত হ'য়ে বললো—'ওগুলো থাক দাদা, মহেন্দ্র এসে নিয়ে যাবে।'

'এর জন্যে আর মহেন্দ্রকে লাগবে না, চল।'

ঘাসের আঙিনাটুকু পার হ'য়ে দু-জনে উঠে এলো একতলার খোলা বারান্দায়। দাদার আগমন-সূচক টুনকির চীৎকার ঘুমের মধ্যেও বিজয়ার কানে পৌঁছেছিল। ঘুম তাঁর হালকা হ'য়ে এসেছিল এমনিতেই, ওঠার প্রায় সময়ও হয়েছে। ধড়মড় ক'রে উঠে দু'একবার চোখ রগড়ে আঁচলখানা গায়ে জড়িয়ে তিনি বারান্দায় এসে দাঁড়িয়েছিলেন। সুমন্ত্র তাঁর কাছে এসে জিনিসগুলো নামিয়ে চুপ করে দাঁড়ালো। প্রণাম করলো না, কোনদিনই সে প্রণাম করে না, প্রণাম করার অভ্যেসই তার নেই। বিজয়ার বড়ো ইচ্ছে হ'লো, একবার ছেলের গায়ে-মাথায় একটু হাত বুলোন, কিন্তু কী যেন, পেরে উঠলেন না। ভরা চোখে তাকিয়ে বললেন: 'এলি?'

'এলাম।'

'পয়লা তারিখে আসবি লিখেছিলি?'

'কলেজ ছুটি হ'তে দেরী হলো।'

'ও!' তারপর একটু চুপচাপ।

'পথে—ভিড় হয়েছিল?'—আবার বললেন বিজয়া।

'হয়েছিলো—বেশী না।'

বিজয়া চুপ করে ছেলের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

'রোগা হ'য়ে গেছিস।'

সুমন্ত্র নিজে কব্জির দিকে তাকিয়ে বললো: 'কই না তো'।

বারান্দা দিয়েই ঢুকে ডানদিকে ছোট একটা ঘর, সেখানে এসে সুমন্ত্র হাতের কাছে যে চেয়ারটা পেলো, তাতেই বসে পড়লো। এককালে তারই ঘর ছিলো এটা। কিছুদিন আগেও ছিলো। ঐ জানলার ধারে টেবিলে বসে-বসেই সে ম্যাট্রিকুলেশনের পড়া তৈরী করেছে। ইণ্টারমিডিয়েট পরীক্ষায় আগে ঐ খাটেই মশারীর নীচে বই নিয়ে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে। এখনো রয়েছে তার খাট, তার টেবিল-চেয়ার, দেয়ালের আলমারিতে তার অতীত বিদ্যার চিহ্নস্বরূপ পেন্সিল-অঙ্কিত একরাশি পাঠ্যবই।

'তোর ঘর এখন ফাঁকাই থাকে' একটু ইতস্ততঃ করে বিজয়া

বললেন। মাঝে-মাঝে পিণ্টু শোয়। তাছাড়া বাড়ীতে কেউ এলে-টেলে—'

'তা পিণ্টু তো এ-ঘরে থাকতে পারে আজকাল।'

'উপরের বারন্দাতেই পিণ্টুর জায়গা করে দিয়েছি। ওখানেই পড়ে, ওখানেই শোয়।' একটু চুপ করে থেকে একটু থেকে বিজয়া বললেন —পিণ্টুর আবার একটা ঘর। বাড়ীতেই থাকে না, সারাদিন বাইরে-বাইরে কাটায়।'

'ও। খুব ঘুরে বেড়ায় বুঝি?'

'আর কিছু করে না। নতুন সাইকেল শিখেছে, চাকার উপরেই আছে। আবার বয়স্কাউটের দলে ভর্তি হয়েছে—তারও তাড়না কম না।'

'রাইবেশী নাচ ও নাচে নাকি?' বলে সুমন্ত্র নিজের মনেই অস্ফুটে হেসে উঠলো। একটু পরেই বললো, 'ওর না কোন ক্লাস হলো এবার?'

'ক্লাস এইট হলো। হু-হু করে ম্যাট্রিকুলেশন এসে পড়বে।'

'তা সময় তো কাটবেই।'

'এবার অ্যানুয়েলে অঙ্কে ফেল করেছিলেন শ্রীমান।'

মৃদু হাসল সুমন্ত্র, 'অঙ্কে আমরা তো সবাই পণ্ডিত।'

'তা শোন—ফেল করে তো ভেকু-ভেকু মুখ করে এসে দাঁড়িয়েছে। তোর বাবাকে বললে—হেডমাস্টার বললেন তুমি একবার গিয়ে দেখা করতে—ওঁকে তো জানিস, ওসব ওঁর ধাতে নেই। বলেই বসলেন, বেশ ফেল করেছো, থাকো আর এক বছর ঐ ক্লাশেই। আমি কত বোঝালাম—তোমার মুখের একটা কথার জন্য ছেলেটার একটা বছর নষ্ট হবে! তা উনি তো কিছুতেই গেলেন না। দু'দিন পরে ছেলে লাফিয়ে এসে বললো 'প্রমোশন পেয়েছি।'

'দিলে প্রমোশন? আমাদের সময়ে কিন্তু কলেজিয়েট স্কুলে বেজায় কড়াকড়ি ছিলো।'

'শোন না। ওঁর সঙ্গে একদিন হেডমাস্টারের কোথায় যেন দেখা। পিণ্টুর কথা উঠলো। হেডমাস্টার বললেন, 'ও সুমন্ত্রের ভাই বলেই প্রমোশন দিলুম। কেমন আছে আপনার বড় ছেলে?'

কথাটা বলে বিজয়া সুমন্ত্রর চোখের দিকে তাকিয়েও হাসলেন।

সুমন্ত্রও হাসল একটু। তারপর হঠাৎ বললে, 'উঃ কী গরম।'

'গরম, না ? বিজয়া চারিদিকে তাকিয়ে বললেন, 'একখানা পাখা নিয়ে আয় তো টুনকি, একটু হাওয়া করি।'

সুমন্ত্র ব্যস্ত ভাবে বললো 'পাগল নাকি ? হাওয়া করবে কী।'

বিজয়া হেসে বললেন, 'আচ্ছা, আমি না হয় না করলাম টুনকিই করুক।'

'না-না, কাউকে হাওয়া করতে হবে না, কেউ হাওয়া করলে আমার ভয়ানক অস্বস্তি লাগে।'

ততক্ষণে টুনকি কিন্তু একখানা পাখা হাতে করে এসে দাঁড়িয়েছে।

বিজয়া পাখাটা নিয়ে দু'-একবার হাত নাড়তেই সুমন্ত্র এক ঝাপটায় বলে উঠলো, 'আঃ করো কী ! বলছি ওসব ভাল লাগে না।'

বিজয়া তক্ষুণি পাখাটা রেখে বললেন 'তাহ'লে থাক বাপু।'

একটু লজ্জিতভাবে বলল সুমন্ত্র—'এই তো দিব্যি ফুরফুরে হাওয়া আসছে জানলা দিয়ে।'

বিজয়া আস্তে-আস্তে বললেন—'তুই আসবি জানতুম না তো—তা মাছ-তরকারি সব আছে, দু'টো ভাত ফুটিয়ে দিই গে, স্নান করে আয়।

আমি তো খেয়ে এসেছি স্টীমারে। স্নানও করেছি।

আহা—ওসব খাওয়াতে নাকি পেট ভরে।

ভরে না ! যা খেয়েছি, বাব্বাঃ !

এতক্ষণে টুনকি একটা কথা বললে—কী খেয়েছো দাদা ?

ওঃ, কত কী ! অত খাওয়া যায় না। আচ্ছা মা, স্টীমারে কী চমৎকার কাঁটা ছাড়ানো ইলিশ দেয়। তোমরা ওরকম রাঁধতে পারো না ? কী নরম, মুখে দিলে গলে যায়।

'কী যেন রে, ওরকম আমরা কোনদিন রাঁধিনি। জলে সেদ্ধ করে কুশ দিয়ে কাঁটা ছাড়ায় শুনেছি। মাছটাকে আগেই অতক্ষণ ধরে সেদ্ধ করলে মাছের কি আর স্বাদ থাকে ছাই।'

'থাকে না ! চমৎকার হয় খেতে। ও'রকম তোমরা পারো ?'

কথাটা খচ্ করে বিজয়ার মনে বিঁধলো। মনে পড়লো এই সেদিনও মন্তু বলেছে, 'মা যত জায়গাতেই খাই, তোমার রান্নার মতো অত ভালো কিছুই খেতে লাগে না।

'হস্টেলের ঠাকুর কেমন রাঁধে রে ?' একটু চুপ করে থেকে তিনি

বললেন।

'ওঃ, হস্টেলের আবার খাওয়া। দু'চক্ষে দেখতে পারিনি এই ঠাকুরগুলো কে। তোমরাও তো একটাকে পুষছো। একটা বাবুর্চি রাখলে পয়সা দিয়ে সুখ। সত্যি রাঁধতে জানে।'

'আহা—কত যে বাবুর্চির রান্না খেয়েচিস?'

'কেন, কলকাতার সব হোটেলে তো ওরাই রাঁধে।'

'হোটেলে খুব খাস বুঝি?'

'তা—খেতে হয় বইকি মাঝে মাঝে।'

'অসুখ করে না?'

'অসুখ করবে কেন?'

'হোটেল গুলোতে তো যা-তা দেয়—কুকুরের মাংস, সাপের চর্বি—'

'তা কেন হবে! বড়ো-বড়ো হোটেল—শহরের সেরা লোকেরা আসে সেখানে, সাহেব-মেম আসে। আলাদা কাণ্ড সেখানকার।'

'খুব সুন্দর বুঝি?' টুনকি জিজ্ঞেস করলো।

কিন্তু টুনকির প্রশ্ন চাপা প'ড়ে গেলো বিজয়ার মন্তব্যে, 'বলিসনি ঐ সাহেব-মেমগুলোর কথা। ওদের কি কোনো ঘেন্নাপিত্তি আছে, না বাদ-বিচার আছে। যা পায়, তা-ই গোগ্রাসে গেলে।'

'তাই তো, তাই তো।' মাথা ঝাঁকিয়ে ব'লে উঠলো সুমন্ত্র। 'যা-তা খায় ব'লেই তো ওদের অমন স্বাস্থ্য! যা বোঝো না, তা নিয়ে কেন কথা বলো?'

'বেশ—বেশ' সবই তুই বুঝিস। তাহ'লে এখন আর কিছু খাবি না?'

'চা খেতে পারি একটু।'

'চা! আর একটু বেলা পড়ুক, কেমন? এখন একটু সরবৎ ক'রে দিই, ঘোলের সরবৎ—'

'না-না—তোমাদের ঐ সরবৎ-টরবৎ আমি কোনোদিনই খাই না। জানো না? যা বলছি তা-ই করো।'

একটু চুপ করে থেকে বিজয়া বললেন, 'কী খাবি চায়ের সঙ্গে?'

'যা' দাও।'

'লুচি?'

'লুচি—খেতে পারি।'

'আর বেগুনভাজা?'

'অত খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে জিগ্যেস করো না তো মা, যা হয় এনে দাও!'

বিজয়া দ্বিরুক্তি না-ক'রে চ'লে গেলেন। সুমন্ত্র চেয়ার থেকে উঠে খাটে গিয়ে শুয়ে পড়লো। চারদিক কেমন চুপচাপ নিঃসাড়-নিশ্চেতন যেন। জানালা দিয়ে একটুখানি রাস্তা চোখে পড়ে। যতদিন সে ও-ঘরে কাটিয়েছে, ঐ রাস্তাটার বিষয়ে বিশেষ-কিছু ভাবেনি। আজ লক্ষ্য করলো, কী সঙ্কীর্ণ ঐ রাস্তা, কেমন বিবর্ণ মেটে রঙের। আর হঠাৎ উপলব্ধি করলো যে সে ঢাকায় এসেছে। তখন একটা দীর্ঘশ্বাস পড়লে তার। মুখ ফিরিয়ে তাকিয়ে দেখলো, টুনকি সেই তখন থেকে ঠায় দাঁড়িয়ে আছে। তাকে কাছে ডেকে বললে, 'কী কেমন আছিস?'

টুনকি চুপি-চুপি বললো, 'দাদা, কলকাতা কেমন?'

'খুব সুন্দর।'

'আমাকে নিয়ে যাবে একবার?'

'যাবি তুই?'

'কী ক'রে যাবো?'

সুমন্ত্র একটু ভেবে বললো, 'যখন কলেজে পড়বি, তখন যাবি!'

'কই, দিদি তো এখানেই পড়ছে।'

'তুই বলিস বাবাকে, কলকাতায় পড়বি।'

টুনকি হঠাৎ গম্ভীর হ'য়ে গেলো। বললে 'না, বাবাকে বলবো না! তুমি যদি নিয়ে যাও তো যাবো।'

'সুমন্ত্র ওর ঝাঁকড়া চুলে হাত বুলিয়ে বললো, 'আজ স্কুল ছিলো না?'

'ছিলো তো। আজ কিনা শনিবার—'

'ও আজ শনিবার।'

'আজ শনিবার, মায়ারা আজ শিলং চ'লে গেলো।' বলে সুমন্ত্র খাট থেকে নামলো, নিয়ে এলো সুটকেসটা ঘরের মধ্যে।

'ওটা একটু খুলবে, দাদা? দেখবো?'

'ছাখ।'

কিন্তু সুমন্ত্রর বাক্সে আশ্চর্য লোভনীয় কোনো সামগ্রী নেই। মামুলি

রকমের জামা-কাপড়, প্রসাধনের টুকিটাকি, খান দুই বই। ডালার সঙ্গে লাগানো কাপড়ের খাঁজ ঘেঁটে-ঘেঁটে সুমন্ত্র ছোট্ট এক টুকরো কাগজ বের করলো। তাতে মেয়েলি ছাঁচে লেখা : 'দি পাইনেস, শিলং।'

অতি সহজ ঠিকানা, ভুলে যাওয়া অসম্ভব। তবু সুমন্ত্র ঐ কাগজটুকু রেখেছে, তবু সুমন্ত্র কয়েকবার ঐ লেখাটুকু পড়লো। তারপর আবার ভাঁজ ক'রে রেখে দিলো খোপে।

—'কী সুন্দর গন্ধ দাদা তোমার বাক্সে।'

'গন্ধ—না?' সুমন্ত্র কাপড়ের তলায় হাৎড়ে-হাৎড়ে ছোট্ট একটি নল রঙের শিশি বের করলো।

'এসেন্স!' টুনকি রোমাঞ্চিত হ'য়ে উঠলো।

'নে', হাত বাড়িয়ে বললো সুমন্ত্র। টুনকি চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইলে।

'নে এটা।'

'এটা আমি—নেবো?'

সুমন্ত্র মুচকি হাসলো—'ওটাতে এখন আর এসেন্স নেই।'

টুনকি ছোট্ট শিশিটা নাকের সঙ্গে চেপে ধ'রে বললো, 'এসেন্স না-ই বা থাকলো, গন্ধ আছে। আঃ—!'

সুমন্ত্র বাক্স বন্ধ ক'রে রেখে বললো, 'যা এখন ভাগ।'

দৌড়ে পালালো টুনকি, ঝাঁকড়া চুল দুলিয়ে। সুমন্ত্র দরজাটা ভেজিয়ে পকেট থেকে বের ক'রে ধরালো সিগারেট, চিৎ হ'য়ে শুয়ে পড়লো খাটে।

* * *

লুচি, বেগুনভাজা ও বাড়ির তৈরী দু'টি রসগোল্লা সহযোগে সুমন্ত্র তার নীরব ও নিঃসঙ্গ চা-পান শেষ করলো। একটু পরেই দিয়ে গেলো খবরের-কাগজ। ঢাকায় কাগজ আসে বিকেলে। এ-পত্রিকাটি তারই সঙ্গে এসেছে কলকাতা থেকে রেল-ষ্টিমারে। একটু আগ্রহ নিয়েই সে কাগজ খুললো—সময় কাটবে। কিন্তু একটু চোখ বুলোতেই বুঝতে পারলো, কাল সকালে কলকাতায় যে-কাগজ প'ড়ে এসেছে, এ তারই একটু পরিবর্তিত সংস্করণ। তারিখটা শুধু আজকের। কাগজ রেখে দিয়ে উঠলো সে, হাত-মুখ ধুলো বাথরুমে গিয়ে। জামা-কাপড় বদলে প্রসাধন শেষ করতে আরো কিছু সময় নিলো। তারপর এসে দাঁড়ালো বাইরের বারান্দায়। পাঁচটা বাজে, কিন্তু

আকাশে এখনো ভরা আলো। কী চুপচাপ পথঘাট, কী চুপচাপ চারিদিক। মাঝে-মাঝে পাখি ডাকছে দু'একটা। ঝিরঝির হাওয়ায় কাঁপছে তাদের আঙিনার পেয়ারা গাছের পাতাগুলো।

সুমন্ত্রর বড়ো ইচ্ছে করছিলো একটা সিগারেট খেতে—কিন্তু এক্ষুনি হয়তো মা এসে পড়বেন। মা আসবেন, বাবাও এসে পড়তে পারেন। তার চেয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেলেই হয়। কিন্তু বেরিয়ে কোথায়ই বা যাবে? রমনার মাঠে? একা-একা ঘুরবে? স্থানীয় বন্ধুদের মনে আনতে চেষ্টা করলো সে। গেলে হয় কারো বাড়ি। অশোক কেমন আছে না জানি। মনে-মনে বোধ হয় অশোকের কথাই সে ভাবছিলো, এমন সময় বাইরে একটা বাস থামলো, নামলো লঘু পায়ে একটি মেয়ে কুচকুচে কালো পাড়ের শাড়ি পরা, হাতে বই। বাড়ির দিকে আসতে-আসতে মাঝপথেই হঠাৎ সে থমকে দাঁড়ালো, চেঁচিয়ে উঠলো—'দাদা!' তারপর দ্রুত পায়ে কাছে এসে উজ্জ্বল চোখে তাকিয়ে বললো, 'কখন এলে?'

'এই তো,' হাসলো সুমন্ত্র।

'বাঃ! আমরা তো এদিকে তোমার আশা প্রায় ছেড়েই দিয়েছিলাম। শুনলাম, তুমি নাকি শিলং চলেছো।'

সে-কথার কোনো উত্তর না-দিয়ে সুমন্ত্র, বললো, 'তোদের ছুটি হয়নি এখনো?'

'এই তো—হ'য়ে গেলো। আজই শেষ।'

'কী করবি ছুটিতে?'

'কী করবো? গড্ নোজ।'

দু'জনে গেলো ঘরের মধ্যে সুমন্ত্রর ঘরে। টেবিলের উপর বই-খাতা রেখেই অরুণা চেঁচিয়ে উঠলো—'এই যে!'

'কী হ'লো?' জিগ্যেস করলো সুমন্ত্র।

'বোলো না—পিণ্টুটার জ্বালায় আর পারি না—এমন দস্যি হয়েছে! এই কলেজে যাবার সময় তাড়াতাড়ি আমার পেন্সিল কাটা ছুরিটা এখানে রেখে গেলাম—নিয়ে ভেগেছে। কোথায় শ্রীমান ওরাং-ওটাং—কোন জঙ্গুবনে ব'সে ল্যাজ নাড়ছেন!'

সুমন্ত্র হেসে বললো, 'খুব তো কথা বলতে শিখেছি, অরু!'

এই মন্তব্যে অরুণা একটু খুশি না-হ'য়ে পারলো না। আঙুলের মধ্যে আঙুল ঢুকিয়ে একটু চাপ দিয়ে বললো, 'সকালবেলা হঠাৎ আমার একবার মনে হয়েছিলো যে, আজ তুমি আসবে।'

'আমাদের সব মনে-হওয়াই যদি এরকম সার্থক হ'তো, তাহ'লে আর কথা ছিলো না।'

অরুণা হঠাৎ একটু লাল হ'য়ে উঠলো। অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে ডাকলো, 'মা—মা!'

তারপর, সুমন্ত্রর দিকে ফিরে—'বড়োদিনের ছুটিতে তুমি এলে না, তা-ই নিয়ে মা কত যে দুঃখ করেছেন। বাবাও কম যান না, কেবলই বলেন—'ছেলেটা করে কী কলকাতায় ছুটিতে ব'সে!'

'আর কী বলেন বাবা?'

'বাবা কাজ ক'রেই সময় পান না—বেশি কথা বলবেন কখন? মা-ই তাঁকে বলেন—'ওগো তোমার ছেলে নাকি নাচের দলে গিয়ে ভিড়েছে!'

বিজয়ার কথার সুরের অবিকল নকল করলো অরুণা।

সুমন্ত্র হেসে উঠলো। সেই মুহূর্তে বিজয়া ঢুকলেন ঘরে, ভাই-বোনে চোখে-চোখে ইশারা ঝলসে গেলো। বিজয়া বললেন, 'এই যে অরু এসেছিস—টেবিলে তোর ভাত রেখে এসেছি, খেয়ে আয়।'

অরুণা কপাল কুঁচকে বললো, 'আজ ভাত খেতে ইচ্ছে করছে না।

'এই এক কথা মেয়ের, ভাত খেতে ইচ্ছে করে না। এই তো কলেজ-ফেরতা খিদে—এখন ভাত না-খেলে চলে! যাবার সময় কি আর খাওয়া হয় কিছু! যা—আড় মাছের ঝোল আছে। তখন তো খেয়ে যেতে পারিসনি—পেটির মাছ রেখেছি একখানা।'

অরুণা অগত্যা বললো—'যাচ্ছি।'

'কলেজ-টলেজ ছুটি হলো, এবার খেয়ে-দেয়ে শরীর ভালো কর তোরা' বলে বিজয়া চলে গেলেন। উপরের ঘরে কাপড়-চোপড় ছড়ানো রয়েছে, আলনায় তুলতে হবে।

সুমন্ত্র আর অরুণা পরস্পরের দিকে একবার তাকালো—হাসির ঝিলিক দিল দু'জনেরই চোখে। অরুণা বললো—'মা'র যেন মাথা খারাপ হচ্ছে দিন-দিন। দিবারাত্র চরকি-বাজির মতো ঘুরছেন আর খামকা যত কথা

রাজ। তা দিয়ে মোটা-মোটা তিন ভল্যুমের একটা বড় বই করে দেয়া যায়।'

'এবার শরীর-টরীর ভালো কর কি, ঢাকায় তো দুধ-মাছের ছড়াছড়ি!' মুখ টিপে হাসলো সুমন্ত্র।

'ঐ এক কথা ওঁদের মুখে—শরীর—শরীর। দিব্যি সুস্থ দেহে প্রফুল্ল-চিত্তে আছি—শরীর যা একটু খারাপ হয়, তা ওঁদের ঘ্যাঙর-ঘ্যাঙর শুনেই।'

দীর্ঘশ্বাস ফেললো সুমন্ত্র—'মন্তুটা তো নাচের দলে ভিড়ে উচ্ছন্নেই গেলো!'

খিল-খিল করে হেসে উঠলো অরুণা। 'উঃ যত সব কথা ওয়াইল্ড! তুমি নাকি দিনে-রাত্রে কখনো হস্টেলেই থাকো না। উদয়শঙ্করের হোটেলই নাকি তোমার ঠিকানা! আর—আর' অরুণা হাসতে-হাসতে আঁচলে মুখ ঢাকলো।

'আর—কী?'

'একদিন নাকি মদ খেয়ে হস্টেলে ফিরেছিলে—'

মুহূর্তে লাল হয়ে উঠলো সুমন্ত্রর মুখ—'কে বলেছে এসব কথা?'

'বলবে আবার কে? হাওয়ায় ভেসে আসে। বড়োদিনের সময় এসেছিলো জিতেনবাবুর ছেলে—তোমাদের কলেজে পড়ে বুঝি—'

'কে বল তো?'

'প্রতাপ বুঝি নাম—'

'ও প্রতাপ! ওকে আমরা স্কাম্ বলি। গুজবরূপ নর্দমার উপরকার ময়লা ও। সেইজন্যেই বুঝি আয় বাছা ঢাকায় আয়, বলে এত হাহাকার। ওঁরা বিশ্বাস করেছেন ওসব কথা?'

'বাবা উড়িয়ে দিয়েছেন, কিন্তু মা···কী জানি বাপু—কলকাতা জায়গা তো ভালো নয়।' অরুণার কথায় আবার বিজয়ার সুর লাগলো, 'মাসে-মাসে এতগুলো যে টাকা নেয়, তাও-বা করে কী?'

'এতগুলো!' নাক কুঁচকে সুমন্ত্র বলে উঠলো—'টাকা বেশি চাইলেই উপদেশের একটা মালগাড়ি পত্ররূপে এসে হাজির হবে। সে ভয়ে বেশি টাকা চাওয়া ছেড়েই দিয়েছি।'

'এসব কিছুই হতো না, ক্রিসমাসে একেবারে এলেই পারতে।'

'ক্রিসমাসে কলকাতাতে সবাই আসে, ছেড়ে কেউ যায় না।'

'এ ছুটিতেই আসবে না লিখেছিলে।'

'আসবো না লিখিনি—পরে আসবো লিখেছিলাম।'

'গেলে না কেন শিলং?'

'শিলং গিয়ে কী হবে? ঢাকার মত স্বাস্থ্যকর জায়গা কি আর জগতে আছে! তাছাড়া মাছ-দুধ তরকারি'—'সুমন্ত্র তার কণ্ঠস্বরের তিক্ততা চেষ্টা করেও চেপে রাখতে পারল না।

অরুণা হেসে উঠলো—'যা বলেছো!'

তারপর হঠাৎ সুর বদলে বললো, 'খুব নাচ দেখলে দাদা?'

'উদয়শঙ্কর তো ঢাকাতেও এসেছিলেন, দেখিসনি তোরা?'

'তা দেখিনি! তিনদিন দেখেছি। একদিন বাড়ি থেকে একদিন কলেজ থেকে—'

'আর একদিন?'

'আর একদিন—ও এমনি গিয়েছিলাম।' অরুণা একটু লাল হয়ে উঠলো। তাড়াতাড়ি বললো, 'উদয়শঙ্করের সঙ্গে তোমার আলাপ হয়েছে?'

'দেখা হয়েছে দু'বার। কেমন লাগলো নাচ?'

'ভালো লাগলো; খুব—খুব ভালো লাগলো। কী সুন্দর দেখতে মানুষটা।'

'সুন্দর।' সুমন্ত্র সংক্ষেপে বললো।

'সেদিন আমরা বাড়িশুদ্ধ সব গিয়েছিলুম—'

'সব?'

'বাবা বাদে। বাবা তাঁর মক্কেলদের নিয়েই আছেন, নাচ দেখবেন কী! কী যে ভালোবাসেন ঐ বাজে লোকগুলোর সঙ্গে কথা বলতে! মা তো নাচ দেখে মুগ্ধ!'

'মুগ্ধ! বলিস কী?'

'তারপর যা মজার কথা বললেন! তা মন্ত যদি এদের সঙ্গে একটু মিশেই থাকে, এমন কী দোষ করেছে।'

'ইস্—কত দয়া!'

'ও'করম হয় মাঝে-মাঝে। যদি পারো ওঁদের সন্দেহভঞ্জন করতে, শিলং যাবার পাসপোর্ট জুটে যেতেও পারে শেষ পর্যন্ত।'

'অত গরজ নেই আমার—' নীচু গলায় বললো সুমন্ত্র।

পাশের ঘর থেকে এলো টুকনরি গলা—'দিদি খাবে এসো।'

'ঐ রে ঘণ্টা বাজলো। আর একটু দেরী করলেই তো মা এসে বকতে শুরু করবেন। খিদেও পেয়েছে, যা-ই বলো!'

'যা, খেয়ে আয়।'

অরুণা উঠে দাঁড়ালো।

'শোন,' সুমন্ত্র হঠাৎ বললো, 'অশোকের খবর রাখিস্ কোনো?'

সেই মুহূর্তে অরুণা ছিলো দরজার কাছে এবং সুমন্ত্রর দিকে ছিলো তার পিঠ ফেরানো। এটা ভাগ্যের কথাই বলতে হবে। নয়তো তার মুখের চেহারা দেখে সুমন্ত্র ভাবতো কী? একটু চুপ করে নিজেকে সামলে নিলো সে। মুখ না ফিরিয়েই বললো, 'আছে এখানেই।'

'এখানে আছে, তা-তো জানি। আসে-টাসে?'

'আসে মাঝে-মাঝে।' অরুণা আধো মুখ ফিরিয়ে দাঁড়ালো। একটু পরে নিজেই আবার বললো, 'তোমাকে চিঠিপত্র লেখে না?'

'কই, না তো!'

'তুমিও লেখ না বুঝি?'

সে কথার জবাব না দিয়ে সুমন্ত্র বললো, 'যাই ওর খোঁজ করে আসি একটু।'

অরুণা তখন ইচ্ছে করলেই বলতে পারতো—গিয়ে কী করবে, তিনি আধ ঘণ্টার মধ্যেই এখানে আসবেন। কিন্তু অরুণা বললো না, বলতে পারলো না। বারান্দা পার হয়ে যেতে-যেতে বিজয়া বললেন, 'অরু, তুই দাঁড়িয়ে আছিস। খেয়ে নে বাপু, ভাতগুলো যে হিম হয়ে গেলো।

'যাই মা—যাই।'

একা ঘরে সুমন্ত্র দু'একবার পায়চারী আরম্ভ করলো। বেলা পড়ে এসেছে। এই গ্রীষ্মের এমন যে লম্বা দিন, তাও ঢলে পড়েছে দীর্ঘায়িত ছায়ায়। এখনই হয়তো বাবা ফিরবেন কোর্ট থেকে। আবার তাঁর সঙ্গে লম্বা ভাষণের ফিরিস্তি। সুমন্ত্র তার ছোট্ট আয়নার সামনে একটু দাঁড়ালো। চুলে চিরুণী চালিয়ে মস্ত সিল্কের রুমাল মুখে বুলালো একবার, তারপর বেরিয়ে গেলো।

রাত্রে খাওয়ার সময়ের আগে বাবার সঙ্গে দেখা হলো না সুমন্ত্র'র। হৃষীকেশবাবু সন্ধ্যার পর কোর্ট থেকে ফিরবেন। সুমন্ত্র তখন বাইরে। সে যখন ফিরলো, হৃষীকেশবাবুর তখন অফিসঘরে মক্কেল পরিবৃত। বাজলো দশটা। আইনের জাল থেকে তবু বেরোবার লক্ষণ নেই। সুমন্ত্র তার মাকে গিয়ে বললো, 'খাবো মা।'

খাবি এখন? একটু দেরি কর না—বাবা এলে পরে একসঙ্গেই খাবি। ওঁর সঙ্গে তোর তো দেখাই হলো না এ পর্যন্ত।

'বড়ো ঘুম পেয়ে গেছে।'

'তা-তো পাবেই—পথের কষ্ট কি কম! উপরের ছোট ঘরে তোর বিছানা করেছি।'

'কেন?'

'ঘরটায় বেশ হাওয়া খেলে—আরামে শুবি। অরুণা শোবে বারান্দায়।'

'অত হাঙ্গামার কী দরকার। আমি নীচের ঘরেই শোবো।'

'আহা—নীচের ঘরে যেন বড়ো সুখ। পিণ্টুকে ওখানে—'

'না-না, আমি নীচেই শোবো বলে দিলাম। আর কোথাও শোবো না।'

বিজয়া ছেলের মুখের দিকে একটু তাকিয়ে থেকে বললেন, 'বিছানা তো পাতা হয়ে গেছে।'

'আমি পিণ্টুর বিছানাতেই শোবো।'

বিজয়া দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, 'বেশ, যা তোর খুশী।'

সুমন্ত্র উদাসীনভাবে একবার শিস্ দিয়ে ঘরের মধ্যে একটু পায়চারী করলো। দেয়ালের কাছে দাঁড়িয়ে হঠাৎ বলে উঠলো, 'বাঃ, সেই ছবিটা দেখছি।'

সুমন্ত্র আর অশোক একসঙ্গে। সুমন্ত্রর ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার আগেকার শীতে তোলা। বসেছে দু'জনে দু'টো হরিণের চামড়া-ঢাকা মোড়ায়। পায়ের নীচে ছড়ানো অনেক নুড়ি-পাথর। অশোকের গায়ে সুমন্ত্রর লতা-আঁকা খদ্দরের চাদর। দু'জনের মধ্যে অশোক দেখতে ভালো, ফটোগ্রাফারই বদলে দিয়েছিলো। গলা-খোলা পাঞ্জাবীতে সুমন্ত্রর তরুণ কণ্ঠ ভারী সুন্দর প্রকাশ পেয়েছে। সবে দেখা দিয়েছে গোঁফের রেখা। দু'জনের মুখের কৈশোর সীমন্তের নিটোল নির্মলতা। সুমন্ত্রর মনে পড়লো সেই যে শীতের

রোদ্দুরে তারা সাইকেলে চেপে গিয়েছিলো ছবিওয়ালার দোকানে। কী ভালো লেগেছিলো। কী ভালো লাগতো দু'জনে একসঙ্গে কবিতা পড়তে।

'এ ছবিটা কোত্থেকে এলো?' মাকে ডেকে সুমন্ত্র জিজ্ঞেস করলো।

'তোর ঐ বড় ট্রাঙ্কটায় ছিলো!'

'ও ট্রাঙ্কে তুমি আবার হাত দিতে গেল কেন?'

'একদিন এমনি খুলেছিলাম—ঠিক উপরটাতেই ছিলো কাগছে জড়ানো।'

'তা আবার বাঁধিয়ে রেখেছো কেন ঘটা করে?'

'রেখেছি—' কথাটা নিতান্তই বাহুল্য।

সুমন্ত্র ছবির কাছ থেকে সরে আসতে-আসতে বললে— 'এই ছবি রাখাটা আমার একেবারেই ভালো লাগে না।'

'কেন, বাঁধিয়ে না রাখলে ছবি থাকে নাকি?'

সুমন্ত্র রেগে উঠে বললে, 'থাকবে কে? কোন জিনিসটা থাকে? মানুষ থাকে?'

'কী যে বলিস, ছবিটা নষ্ট হয়ে যাচ্ছিলো বাঁধিয়ে রেখেছি। হয়েছে কী তাতে?'

'যত কাণ্ড তোমাদের—কোত্থেকে একটা ছবি টেনে ঘরের মধ্যে লটকেছো। লোকে বলবে কী? তাও যদি ছবিটা ভালো হতো।'

'কেন, ছবিটা তো বেশ সুন্দর।'

'ঐ পদতলে শিলারাশি!' সুমন্ত্র হেসে উঠলো নীচু গলায়।

বিজয়া কথা বলতে-বলতে খাবার টেবিল সাজাচ্ছিলেন, হঠাৎ বলে উঠলেন, 'গ্লাসগুলো সব হলো কী? আস্ত এক ডজন গ্লাস এলো এই তো সেদিন, তা আনতে সময় লাগে তো ভাঙতে লাগে না।'

সুমন্ত্র বললে, 'টেবিলের উপর তো অনেক গ্লাস শোভা পাচ্ছে।

'আটটা আছে—আরগুলোর যে কী গতি হলো—'

'তা এখন আর বেশি লাগবে কিসে?'

'এখন লাগবে না বলেই যেখানে-সেখানে পড়ে থাকবে নাকি? এমনি করেই তো যায়।'

'তা ভাঙবে না? কাঁচের গ্লাস তো ভাঙারই জন্যে।'

'দু'দিন যাক, নিজের জন্য যখন কিনতে হবে, তখন বুঝবি।,

'এখনই বুঝেছি, তোমাকেও দিতে পারি বুঝিয়ে। শোনো, যদি গ্লাস না-ই ভাঙে, লোকে আর নতুন গ্লাস কিনবে না ; আর লোকেরা নতুন গ্লাস না কিনলে ব্যবসা অচল হবে, আর ব্যবসা অচল হলে, আজকালকার সভ্যতাই থমকে দাঁড়াবে। বুঝলে ? সুতরাং গ্লাস ভাঙাটা যে আমাদের কত বড় সামাজিক কর্তব্য—'

'নে—নে, আর ফাজলামি করতে হবে না, থাম। এই চাকরগুলোর জ্বালায় আর পারি নে। পরের জিনিস বলে একফোঁটা দয়ামায়া নেই। ঐ সুন্দর টি-সেটটাকে কানা করেছে সেদিন—'

'কোন টি-সেট ?

'বাঃ- ঐ যে তুই সেবার কলকাতা থেকে এসেছিলি—'

'ও—হ্যাঁ,' একটু লজ্জিত হলো সুমন্ত্র। 'ভেঙেছে বুঝি ?'

'টি-পটের মুখটার কোণ চটিয়ে বিতিকিচ্ছিরি করেছে।'

'ও ভাঙেনি !'

'ওকেই ভাঙা বলে। অত সুন্দর একটা সেট—একখানি খুঁত হলেই তো গেলো।'

'অমন একটু-আধটু যাওয়া ভালো। আমার তো ভালোই লাগে।'

'তোদের ভালো-লাগা।' আর কোনো মন্তব্য না করে বিজয়া ঢাকনা-পরানো চেয়ারগুলোকে পর-পর ঠিকমতো সাজিয়ে রাখতে লাগলেন। সুমন্ত্র তারই একটাতে বসে পড়লো। হাতে অনেক সময়, অথচ কিছুতেই মন নেই, এমনি তার মুখের ভাব।

'অশোকের এতক্ষণ আসা উচিত ছিলো।'

সাইডবোর্ডের ভিতরটা ঘাঁটতে-ঘাঁটতে বিজয়া বললেন।

'অশোক—আসবে নাকি আবার ?'

'ওকে খেতে বলেছি।' ছেলের মুখে খুশীর দীপ্তি দেখবার আশায় বিজয়া মুখ ফিরিয়ে তার দিকে তাকালেন, কিন্তু সুমন্ত্র নেহাৎ সাধারণভাবে বললে, 'আমি গিয়েছিলুম ওর বাড়িতে।'

'ও তখন এখানে। তুই যদি সোজা চলে আসতিস, তা'হলেই দেখা হতো।'

'আমি একটু ঘুরে এলাম। তা ও খাবে তো আবার গেলো কেন ?'

'কী যেন কাজ আছে বললে?' একটু চুপ করে থেকে বললেন, 'বেশ ছেলে অশোক। ভারী ভালো লাগে আমার।'

'আসে বুঝি প্রায়ই?'

'বাঃ, রোজই তো আসে। ওদের ইউনির্ভাসিটির যত ব্যাপার হয়, নিয়ে যায় আমাদের। তুই যদি এখানে পড়তিস, বেশ হতো।'

'বেশ হতো আর কি। সেদিন ওদের একটা নাটক দেখাতে নিয়ে গিয়েছিলো—"ষোড়শী" করলে।'

'কে? অশোক সেজেছিলো নাকি ষোড়শী?'

'না-না, অশোক কেন—ছেলেরা সব করলে, বেশ হয়েছিলো।'

'তুমি আজকাল নানা জায়গায় যাচ্ছো বুঝি? নাচও দেখেছিলে, শুনলাম।'

'সে-ও অশোক। নয়তো আমার কি উপায় আছে, এই ঘর-সংসার ফেলে কোথাও নড়বার?'

'কেন নেই? এই তো দিব্যি নাচে গেলে, থিয়েটারে গেলে।'

'যাই আর কি।' একটু লজ্জিতভাবে বিজয়া বললেন, 'তাই বলে কি যাবার কথা মনে হয় কোথাও? এই বুড়ো বয়সে কি আর শখ থাকে কোনো?'

'মা! তুমি বুড়ো।' এতক্ষণকার উন্মনা ভাব থেকে হঠাৎ চমকে উঠে ধারালো গলায় বললে সুমন্ত্র।

'বুড়ো না হই, হতে আর ক'দিন!'

'বুড়ো হতে ভালো লাগে, না?' সুমন্ত্র খেঁকিয়ে উঠলো।

'আরে বোকা, মন্দ লাগলেই বা কী এসে যায়? বুড়ো যখন হবার তখন তো হবোই।'

'অনেক দেরি তার এখনো। আমি তোমাকে বলে দিচ্ছি, মা, কক্ষনো আর নিজেকে ও'রকম বুড়ো-বুড়ো বলবে না। বিশ্রী লাগে আমার। বি—শ্রী!'

বিজয়া মৃদু হাসলেন। ছেলের দিকে তাকিয়ে গুনগুনানির সুরে বললেন, 'তা বুড়ো কমই বা কী—এত বড় ছেলে যার—'

'নাও—নাও, তোমাদের ওসব কথা মোটেই ভালো লাগে না আমার।'

যেন ছেলের ইচ্ছা অনুসারেই বিজয়া হঠাৎ অন্য কথা তুললেন, 'তুই কেমন রে মন্তু, এবারেও লিখেছিলি ঢাকায় আসবি না।'

সুমন্ত্র মাকে সংশোধন করলে, 'আসবো না লিখিনি, তো পরে আসবো লিখেছিলাম।'

'শিলং যেতে চেয়েছিলি কেন?'

সুমন্ত্র তীক্ষ্ণ চোখে মা'র দিকে তাকিয়ে বললে, 'কারণ নেই কিছু। এমনি। বেড়াতে।'

'এতদিন পর আমাদের একবার দেখতেও ইচ্ছে করে না?'

সুমন্ত্র চুপ। আড়চোখে ছেলের দিকে তাকিয়ে বিজয়াও যেন তাঁর ভুল বুঝতে পারলেন। বলবার দরকার ছিলো না কথাটা, বলে তাঁর নিজেরও কেমন লজ্জা করছিলো। কথাটা উড়িয়ে দেবার জন্যে হালকা সুরে বললেন 'ঢাকারও আস্তে-আস্তে উন্নতি হচ্ছে বেশ। নাচ, নাটক, গান-বাজনা—একটানা-একটা হুজুক লেগেই আছে। সুন্দর রেস্টোরেন্ট হয়েছে নবাবপুরে, পিণ্টুটা সেখানে গিয়েই আইসক্রীম খাবার জন্য পাগল। বেশ লাইফ্ হচ্ছে ঢাকায়।'

চেয়ারটায় ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে সুমন্ত্র হঠাৎ উঠে দাঁড়ালো, 'ছাখো মা, আর যাই করো, আমার সামনে কোনো ইংরিজি কথা বলো না।'

বিজয়া চুপ ক'রে গেলেন। সুমন্ত্র একবার দীর্ঘশ্বাস ফেললো, তারপর আস্তে-আস্তে হেঁটে এলো দরজা পর্য্যন্ত। একটু দাঁড়ালো সেখানে, বাইরে যাবে না ঘুরে আবার ঘরের মধ্যেই আসবে, সেটা স্থির করতে পারছে না যেন। একটু পরে ঘরের দিকেই ফিরছে, এমন সময় বাইরে বারান্দায় খুব মৃদু জুতোর শব্দ হ'লো, আর পরমুহূর্তেই ঘরে এসে ঢুকলো অশোক সেন! অশোক ছেলেটি দেখতে বেশ। মানে, তার ঠিক সেই রকমের চেহারা যা দেখতে ভালো লাগে, এবং দেখলেই ভালো লাগে। আস্তে সে কথা বলে, আস্তে চলে, তাকায় স্নিগ্ধ চোখে, হাসে মিষ্টি ক'রে। তাকে ভালোবাসাও সহজ! দরজা দিয়ে ঢুকেই বন্ধুর সঙ্গে তার প্রায় ঠোকাঠুকি। অশোক হেসে বললে, 'এই তো সুমন্ত্র এসেছে মাসিমা, আপনি ভাবছিলেন।'

বিজয়া একটা বাসনের উপর ঝুঁকে প'ড়ে দেখছিলেন, পুডিংটা ঠিক জমেছে কিনা। চোখ তুলে তাকালেন একবার, কিছু বলবেন না।

সুমন্ত্র অশোকের দিকে দীর্ঘ দৃষ্টিপাত ক'রে বললে, 'তুমিও দেখছি দিন-দিনই সুন্দর হচ্ছো, অশোক।'

মৃদুহাস্যে মন্তব্য স্বীকার ক'রে নিয়ে অশোক বললে, 'তুমি তো অনেক ফর্সা হয়েছো দেখছি।'

'গঙ্গার জল। তুমি এই এসে আবার কোথায় গিয়েছিলে?'

'খিদেটা জমিয়ে এলুম একটু হেঁটে। জঠরের আয়তন অল্প, কিন্তু মাসিমার রান্না বহুল।'

'হুঁ', অকারণ গম্ভীর সুরে সুমন্ত্র বললো। 'চলো একটু ও-ঘরে গিয়ে বসি। পারিবারিক ভোজের ঘণ্টা বাজতে কিছু দেরী আছে।'

সেই ছোটো ঘরটিতে গিয়ে অশোক খাটের উপর পা ঝুলিয়ে বসলো। সুমন্ত্র বসলো বেতের চেয়ারটাকে মুখোমুখি টেনে নিয়ে খাটের গায়ে জুতো খোলা পায়ের চাপ দিয়ে। পকেট থেকে সিগারেটের বাক্স বের ক'রে বললে, 'খাও নাকি?'

অশোক এদিক-ওদিক তাকিয়ে মাঝামাঝি-রকম একটু হাসলো। সুমন্ত্র নিজে একটা সিগারেট নিয়ে বললে, 'খাও না বুঝি, উঁ?'

অশোক মুখচোরাভাবে বললে, 'একেবারে খাই না তা নয়। অভ্যেস নেই।'

'তুমিই ধন্য!' দীর্ঘশ্বাস ফেললে সুমন্ত্র! 'তারাই ধন্য, যারা মাঝে-মাঝে সিগারেট খায়, অভ্যেস করে না। সে-রকম যদি পারতুম, তবে আর ভাবনা ছিলো কী আমার!'

'অভ্যেস করলে বড়ো খরচ।'

'যা বলেছো! তবে অভ্যেসটা করবার সময় খরচের কথা মনে থাকে না, আর খরচের ধাক্কা যখন লাগে, তখন অভ্যেস হ'য়ে গেছে। যাক, এ নিয়ে দুশ্চিন্তা ক'রে লাভ নেই, জীবনটাই এমনি।' সুমন্ত্র প্যাকেটের তলায় দিকটা ঠেলে বের ক'রে অশোকের দিকে বাড়িয়ে ধ'রে বললে, 'নেবে নাকি?

অশোক একবার সিগারেটের দিকে, একবার দরজার দিকে তাকালো। তারপর বললে, 'না থাক, এখন না।'

'নাও না!' একটু জোর দিয়ে বললে সুমন্ত্র।

'থাক, কেউ হয়তো এসে পড়বেন।'

'পড়লেনই বা।'

'পাগল! যদি মাসিমা আসেন—' ছবিটা যেন মনে-মনে চোখের সামনে দেখতে পেয়ে অশোক ব'লে উঠলো, 'ছিঃ।'

'কেন? ছিঃ কেন? যদি খেতেই পারো, লোকের সামনে খেতে পারো না?' সুমন্ত্র সিগারেট ধরিয়ে বুক ভ'রে ধোঁয়া টেনে নিয়ে নাক দিয়ে আস্তে-আস্তে বের করতে করতে বললো।

'তাই ব'লে মাসিমার সামনে!'

'তাই তো।' সুমন্ত্র হঠাৎ ব'লে উঠলো। 'তুমি আমার মাসতুতো ভাই, এ খবরটা নতুন জানলুম।'

অশোকের ফর্সা কান টুকটুকে লাল হ'লো—'ও একটা অভ্যেস হ'য়ে গেছে।'

'কেন মাসিমা ডাকো? আমার মা কি তোমার মা-র বোন?'

'বাঃ! একটু আড়ষ্টভাবে জবাব দিলে অশোক। 'কিছু একটা ডাকতে হয় তো।'

'কেন ডাকতে হয়? না ডেকেও তো দিব্যি চলে, চলে না? আর মাসিমা ব'লে যে ডাকো, সত্যি-সত্যি কি মাসিমা মনে করো?'

কথাটা বিশেষ-কিছু নয়, কিন্তু অশোকের যেন খুব একটা ধাক্কা লাগলো। প্রথমে সে লাল হ'য়ে উঠলো, তারপর একটু ম্লান হ'য়ে নীচু করলো মুখ। একটু পরে বললে, 'অত মনে-করাকরির কী আছে, একটা কথা বই তো নয়। তুমিই বা এ নিয়ে এত বলছো কেন?'

সুমন্ত্র চুপ ক'রে সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়লো ঠোঁট বেঁকিয়ে।

'তা তোমার মাসিমার তোমার সম্বন্ধে খুব উচ্চ ধারণা।'

কথাটার সুর অশোকের ভালো লাগলো না। বন্ধুর দিকে একবার তাকিয়েই চোখ নামিয়ে নিলে। এ-রকম ক'রে কথা বলতে কোথায় শিখলো সুমন্ত্র? এ-রকম ও তো ছিলো না! এ যেন সবটা-না-বলা কথা, যেন নিজেকে লুকিয়ে রাখা। অস্বস্তিবোধ হ'লো অশোকের। সুমন্ত্র আবার বললে, 'এবং তোমার মাসিমার এই উচ্চ ধারণা থেকে যাতে স্খলিত না হও, সেদিকেও তোমার নজর যথেষ্ট।'

'কী যা-তা বকছো!'

'তবে সিগারেট খেলে না কেন ?'

'ধরো—ইচ্ছে করলো না ?'

'তা নয়। তুমি খেতে ইচ্ছুক, কোনো নিরাপদ জায়গায় হ'লে তুমি নিশ্চয়ই খেতে। খেতে কিনা, বলো ?'

অশোক চুপ।

'অথচ এখন তুমি খেলে না, পাছে কেউ দেখে ফ্যালে! আহা, অশোক ভারি ভালো ছেলে—এ কথাটায় পাছে যদি কোনো চিড় ধরে।'

অশোক একটু ভেবে নিজের সমর্থন খুঁজে বের করালো, 'আমি সিগারেট খাই জানলে তাঁরা মনে কষ্ট পাবেন। আর খামকা কারো মনে কষ্ট দিতে আমি চাই না।'

সুমন্ত্র হাসলো—'নিজের স্বার্থের জন্য আমরা যা করি, অনেক সময়েই সেটাকে 'পরোপকার' ব'লে চালিয়ে দিই। আসলে তারই অপর নাম পলিটিক্স।'

'এমন সীরিয়াস তুমি কবে থেকে হ'লে, সুমন্ত্র ?'

'পাগল! আমি সীরিয়াস। কিন্তু তুমিই বা এ-সব কপটতা শিখলে কবে ?'

কথাটা অশোকের বুকে লাগলো। সব স্বভাবের জন্য চিরকাল সে বাহবা পেয়েছে। সত্যিও তার মনে কোনো মারপ্যাঁচ নেই। মারপ্যাঁচ সে জানেই না। সহজ সদ্ভাব নিয়ে সকলের সঙ্গে তার মেলামেশা। শত্রু তার কেউ নেই, বন্ধুরা অনেকেই তাকে ভালোবাসে। 'কপটতা!' একটু আহত সুরে সে ব'লে উঠলো, 'এর মধ্যে কপটতা তুমি কোথায় দেখলে ?'

'তা নয় তো কী ? তুমি সিগারেট খাও, কিন্তু সেই খবরটা রাখো লুকিয়ে, পাছে এঁদের কাছে তোমার সুনামের হানি হয়। তার মানে, তুমি ঠকিয়ে সুনাম আদায় করছো। এটা কপটতা নয় ? শীয়র হিপক্রিসি!'

'বলতে বাধ্য হচ্ছি সুমন্ত্র, একটা তুচ্ছ জিনিষকে নিয়ে তুমি অকারণে ফেনিয়ে বাড়িয়ে তুলছো।'

'এটা কেন মনে করতে পারো না যে আমি সত্যি-সত্যি যা, সেই পরিচয়ই এঁদের দেবো—সিগারেট না-খাওয়ার উপরেই যে-ঠুনকো সুনামের নির্ভর তার লোভ না হয় ছেড়েই দিলে। তার পরেও যদি এঁদের কাছে

আদর পাও, তাহ'লে এটা জানবে যে আদরটা খাঁটি।'

'এত যে বলছো, তুমি পারো এঁদের সামনে সিগারেট খেতে?'

'কেউ জানবে ব'লে ভয়ে মরি না। খাই যখন, লোকে তা জানবেই।'

অশোক জবাব দিলো না। সুমন্ত্র আবার বললে, 'তুমি যদি ভীরু না-হ'তে, তুমিও আমারই মতো ভাবতে। ছলছুতো ক'রে সুনাম কুড়োতে লজ্জা করতো তোমার?'

'আচ্ছা—আচ্ছা, না-হয় আর সিগারেট খাবো না, তাহ'লেই তো সত্যি হবে, কপটতা আর হবে না।'

সুমন্ত্র অশোকের দিকে তাকিয়ে বললো, 'সিগারেট খাবে না তাও রাজী, তবু সুনামের উচ্চ আসন থেকে ভ্রষ্ট হবে না! ধন্য ছেলে তুমি অশোক; জীবনে তোমার অনেক উন্নতি হবে।'

অশোক লজ্জিতভাবে তাড়াতাড়ি বললে, 'আহা—ভারী তো জিনিষ, খেলেই বা কী, না খেলেই বা কী!'

'তা-ই তো! যদি সে-কথাই মনে করো, তাহ'লে এত ভয় পাও কেন? আর সিগারেট খেলেই যাদের চোখে নেমে যেতে হয়, তাদের মতামতের উপর তো অবজ্ঞাই থাকা উচিত।'

অশোক মুচকি হেসে কথাটা স্বীকার ক'রে নিলে—'কী করবো, বলো? সকলেই তো আর একরকম আবহাওয়ায় মানুষ হয় না।'

'কিন্তু মানুষমাত্রেই র‍্যাশনাল হওয়া উচিত। ভেবে দেখবার, বোঝবার ক্ষমতা যার নেই, সে আবার মানুষ কী!'

'ভেবে দেখতে—বুঝতে তুমিই কি পারো সব সময়?'

'সব সময় পারি না, চেষ্টা করি। কুসংস্কার থেকে, সংস্কার থেকে, অভ্যাসের জড়তা থেকে মনটাকে মুক্ত ক'রেই দেখতে চেষ্টা করি সব জিনিস। তা না-করলে আমার আত্মসম্মান বজায় থাকতো না।'

'তুমিও তো একটা জিনিসকে ভালো বলো, আর-একটাকে বলো মন্দ। ভেবে ছাখো, সেটা তোমার ব্যক্তিগত রুচিরই কথা কিনা।'

একটু অসহিষ্ণু স্বরে বললে সুমন্ত্র, 'রুচি এক কথা, আর সংস্কার আর এক কথা। রুচি অনুভূতির ফল, আর সংস্কার জড়তার।'

অশোক কোনো জবাব দিলে না।

'আমাদের বুড়োদের ছাখো না,' সুমন্ত্র বলতে লাগলো, 'বয়েস বুড়ো নয়, মনে বুড়ো। সংস্কারের বস্তা এক-একটি। তারা যা বোঝে, তার চেয়ে ভালো কেউ বোঝে না। তারা যেমন চায়, ঠিক সেই রকম সবাইকে করতে হবে। নিজের ইচ্ছেমতো এতটুকু কিছু করতে পারবে না তুমি। তুমি কেমন ক'রে চুল ছাঁটবে, সেটাও ব'লে দেবে তারা।'

এবারেও অশোক কিছু বললো না। এ-সব কথায় তার যেন বেশি মন নেই, খানিকটা এমনি ভাব। সুমন্ত্র সেটা লক্ষ্য ক'রে বললে।

'থাক, প্রথম দর্শনেই এক পশলা বক্তৃতা ঝেড়ে দিলুম। এবারে আর-সব খবর বলো। কেমন আছো?'

অশোক একটা মামুলিগোছের জবাব দিতে যাচ্ছিলো, এমন সময় পরদা ঠেলে ঘরে ঢুকলো অরুণা। সঙ্গে-সঙ্গে অশোকের শিথিল ভাব দূর হ'য়ে গেলো, টান হ'য়ে বসলো সে, উজ্জ্বল হ'লো চোখ। আর সেই চোখ অরুণার চোখের উপর প'ড়েই স'রে এলো, আর অরুণা সুমন্ত্রর কাছে দাঁড়িয়ে বললে, 'খেতে চলো, দাদা, তোমরা।'

* * *

হৃষীকেশবাবুর বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি, যদিও মুখে এখনো বয়সের ছাপ পড়েনি। ক্রমান্বয়ে কুড়ি বছরের আইনের পেশা তাঁর মুখে যে-ক'টা রেখা ফেলেছে, তার দোষ কাটিয়েছে মজবুত স্বাস্থ্যের জোর। শরীরটি তাঁর টনটনে। খাওয়াতে এখনো প্রচুর উৎসাহ। খেতে পারেন, খেয়ে হজমেরও ত্রুটি হয় না; এবং ভোজনের সহায়করূপে তিনি শুধু এই খাবার ঘরটিতেই ইলেকট্রিক পাখা বসিয়েছেন। স্বভাবতই উচ্চস্বরে কথা বলেন তিনি, এবং যে কোনোরকম ভাববৈলক্ষণ্যে—উৎসাহ কি মতদ্বৈধে কি ঈষৎ অসন্তোষে—সে-স্বর মাত্রা ছাড়িয়ে চড়ে ওঠে। সেই জন্যে হঠাৎ তাঁকে বদমেজাজী বললে ভুল হয়; কিন্তু যারা তাঁকে ভালো করে জানে, তারা তাঁকে সত্যিকারের ভালো বলেই জানে।

মক্কেল-মুক্ত হৃষীকেশবাবু জমকালো খিদে নিয়ে বসেছেন টেবিলের মাথায়, তার ডানদিকে সুমন্ত্র, আর বাঁদিকে অশোক, আর সুমন্ত্রর পাশে অরুণা। প্রাথমিক ভোজ্যবস্তু টেবিলে আনা হচ্ছে, এমন সময় সুমন্ত্র হঠাৎ বললে, 'তুই আমায় চেয়ারটায় আয়, অরু।'

হৃষীকেশবাবু বলে উঠলেন, 'কেন? কেন?'

'এখানটায় ভালো হাওয়া লাগে না।'

'হাওয়া লাগে না! আমি তো বেশ পাচ্ছি। পাখার ঠিক নীচে বসলেই তো হাওয়া পাবি না—বোস ওখানেই।'

সুমন্ত্র শুধু বললে, 'আয় অরু, এখানে।'

জায়গা বদল হলো। অরুণা আর অশোক মুখোমুখি। সুমন্ত্র পিতৃদেব থেকে অন্তত একটা চেয়ার দূরে। হৃষীকেশবাবু হাঁক দিলেন—'কই, আনো না কী আছে তোমাদের।'

'এই তো—এই তো,' ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠলেন বিজয়া। ভাত, বড়ো-বড়ো টুকরোতে ভাজা রুই মাছ আর রুইয়ের মাথা দিয়ে রাঁধা মুগের ডাল পরিবেশিত হলো।

সুমন্ত্র মাথা নীচু করে আহারে মন দিতে যাচ্ছিলো, হঠাৎ তুলে বললে, 'মা, তুমি বসবে না?'

'নে—নে খা এখন', বিজয়া অন্যমনস্কভাবে বললেন।

'তুমি বসবে না? তুমি খাবে না?'

বিজয়া উত্তর না দিয়ে সুমন্ত্রর পাতে খানিকটা ঘি ঢেলে দিলেন।

'আঃ—আমাকে ঘি দিলে কেন? ঐ ন্যাষ্টি জিনিসগুলো কবে খাই আমি!'

'ঘি ন্যাষ্টি।' হৃষীকেশবাবুর নির্ঘোষ গলা বেজে উঠলো। 'কে বললে তোকে এ কথা? মুর্খ ছাড়া একথা কে বলে?'

সুমন্ত্র নিঃশব্দে ভাতের বেড়া দিয়ে তরল সোনালী ঘিয়ের ছোটো একটা দ্বীপ রচনা করলে। তারপর বিজয়ার দিকে তাকিয়ে বললে, 'তুমিও বোসো না, মা। মহেন্দ্র দিতে পারে না?'

'পাগল! মহেন্দ্র দিলে কারো পেটই ভরবে না।'

'নিজেই যদি সব করবে, এতগুলো লোকজন রেখেছো কেন? বোসো তুমি একেবারেই হয়ে যাক।'

'আচ্ছা—আচ্ছা, আমার জন্যে ভাবতে হবে না তোকে। তুই খা?'

সুমন্ত্র আবার মাথা নীচু ক'রে খাওয়ায় মন দিলে। একটু পরে বললে, অনেকটা যেন আপন মনে, 'তা খাবে কেন! সবার শেষে একা ব'সে

চাকরদের সাথে না খেলে তোমাদের মান থাকে না।'

কথাটা হৃষীকেশবাবুর কানে পৌঁছালো, মাছের মুড়োর স্নিগ্ধ পদার্থগুলো আধো-বোঁজা চোখে ঘাড় কাৎ ক'রে শুষে নিয়ে সরস ও গাঢ় কণ্ঠে ব'লে উঠলেন, স্বামী-পুত্রকে নিজের হাতে খাওয়ানো—তার চেয়ে বড় সুখ স্ত্রীলোকের আর কি অছে!'

ফশ্ ক'রে উঠলো অরুণা, 'একটু ভুল বললে, বাবা। এখানে কন্যাও আছে একজন।'

মাছের মুড়োটাকে সোৎসাহে দাঁত দিয়ে আক্রমণ ক'রে হৃষীকেশবাবু বললেন, 'মেয়ে আবার কে! মেয়ে তো পর।'

'পর! অরুণা ব'লে উঠলো। আমি তোমার পর!'

মুড়োটাকে দাঁতের ফাঁকে নিষ্পেষণ ক'রে অরুণার পিতা বললেন, 'বিয়ে হ'লেই তো মেয়ে পর হ'য়ে গেলো!'

'পর হয়ে গেলো!' অরুণা তার বড়ো-বড়ো কালো চোখ তুলে বাবার দিকে তাকালো।

'ছাখ না তোর মাকে। তাঁরও তো মা-বাবা আছেন। কিন্তু কোথায় এখন তাঁর মা-বাপ, আর কোথায় এখন তাঁর ভাই-বোন!'

অরুণা তার মাকে দেখলো।

'তুইও তোর স্বামী-পুত্রকে এমনি ক'রেই খাওয়াবি'—

হঠাৎ সেই গম্ভীর ও সুউচ্চ স্বরের মাঝখানে শোনা গেলো সুমন্ত্রর ক্ষীণকণ্ঠ, 'আর এমনি ক'রেই তোর জীবন ধন্য হবে।'

'কী হে সুমন্ত্র, কথাটা পছন্দ হ'লো না বুঝি? এ-সব বুঝি তোমাদের মর্ডান শাস্ত্রে লেখে না?'

সুমন্ত্র নিঃশব্দে খেতে লাগলো!

'তোরা কী বুঝবি, এই তো সেদিন তোদের জন্ম হ'লো। বাপের বাড়িতে কি মেয়েদের কোনো সত্তা আছে নাকি? বিয়ে হ'লে তবেই তাদের জীবন আরম্ভ।'

স্ত্রীলোকের সম্বন্ধে এত শুনেও কিছুমাত্র নিরুৎসাহ হ'য়ে অরুণা বললে, 'আর মাছভাজা আছে নাকি, মা—বড়ো ভালো হয়েছে।'

'নে-নে আর মাছভাজা খেতে হবে না,' হৃষীকেশবাবু ব'লে উঠলেন,

'মেয়ের আবার অত খাওয়ার শখ কী? কত দেবে শাশুড়ি খেতে!'

বিজয়া মাছভাজার থালা নিয়ে এসে মেয়ের পাতে আর একখানা দিতে যাচ্ছিলেন, হৃষীকেশবাবু হাঁ-হাঁ করে উঠলেন।

'তুমি খাবে না? চাকরেরা খাবে না! এদিকে তো আমার পাতে এক ঝুড়ি দিয়ে গেছো! এই নে।' নিজের পাত থেকে আস্ত একখানা ভাজা তুলে হৃষীকেশবাবু কন্যাকে দিলেন।

অরুণা বললে, 'দিতে পারলে বাবা, তোমার প্রাণে সইলো?'

হৃষীকেশবাবু প্রশস্ত হেসে বললেন, 'আমি খেতে ভালোবাসি তা ঠিক, এবং খাওয়ার সময় অন্য কারো কথা মনেও থাকে না—'

'মা-র কথা তো দিব্যি মনে থাকে দেখলাম,' বললে অরুণা।

বিজয়া সলজ্জভাবে বললেন, 'নে, আর ফাজলেমি করতে হবে না। তুমি আবার ওকে দিতে গেলে কেন—এখানে তো কত ছিলো।' বলতে-বলতে স্বামীর পাতে আর-একখানা মাছ ভাজা, ফেললেন।

'আহা-হা। করলে কী, করলে কী! তোমরা কেউ কি খাবে না? আর-কেউ কি খাবে না? আমি একাই সব খাবো নাকি?'

অরুণা বললে, 'ইস, খুব যে ভালোমানুষি, বাবা!

হৃষীকেশবাবু অশোকের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'দেখলে! আমার খাওয়া নিয়ে আমার মেয়ে পর্যন্ত ঠাট্টা করে আমাকে। তা মন্দ না-মন্দ না —খাওয়াটা জীবনের একটা প্রধান সুখ তা তো ঠিকই! আর স্ত্রীলোকের আবার একটা খাওয়া, তা—কী বলো? মেয়ে হ'য়ে যারা জন্মায়—'

সুমন্ত্র হঠাৎ চোখ তুলে বাবার দিকে তাকিয়ে বললে, 'ছাখো বাবা, সমস্তক্ষণ ওরকম মেয়ে-মেয়ে বলো না, আমি তোমাকে ব'লে দিলাম।'

হৃষীকেশবাবু এক মুহূর্তের জন্য খেতে ভুলে গেলেন। 'তুমি আমাকে ব'লে দেবার কে, সেটা শুনি?'

'বলো যে সব সময় মেয়ে বলে নাক শিঁটকাচ্ছে, এই মেয়েরা না-থাকলে কী দশা হ'তো, সেটা একবার ভেবে দেখেছো?'

হৃষীকেশবাবু সুমন্ত্রর দিকে মুহূর্তকাল তাকিয়ে রইলেন, তারপর চেয়ারে হেলান দিয়ে গলা ছেড়ে হেসে উঠলেন হা-হা ক'রে।

'বেশ, বে—শ, বেশ! এখন আমাকে ছেলের কাছে শিখতে হবে!

এই তো বেশ !'

শেষের কথাটা ঘরের দেয়ালে আছাড় খেয়ে সিলিং-এ প্রতিধ্বনিত হ'লো। হাসির ধাক্কা সামলে উঠে হৃষীকেশবাবু মুড়িঘণ্টো মনোনিবেশ করলেন। তারপর খানিকক্ষণ কেউ কিছু বললে না।

হঠাৎ সুমন্ত্রর দিকে তাকিয়ে হৃষীকেশবাবু বললেন—'এই মন্তু, অত বড়ো-বড়ো চুল রেখেছিস কেন ?

সুমন্ত্র বললে—'এই তো আসবার দিন ছেঁটে এলাম।

'এ কী-রকম চুল ছাঁটা তোদের। সমস্ত চুল তো র'য়েই গেছে।

মুহূর্তে সুমন্ত্র আর অশোকের মধ্যে চোখের বিদ্যুৎ ঝলসে গেলো। হৃষীকেশবাবু ব্যঙ্গের স্বরে বললেন—'ঠিক আমাদের দেশের লেঠেল সর্দারের মতো। সেই আমাদের কামাখ্যা বরন্দাজ ছিলো—এমনি ঝাঁকড়া চুল—পাঁচ হাত লম্বা লাঠি নিয়ে কী তার লম্ফঝম্ফ !'

অঙ্গ-ভঙ্গি সহকারে বর্ণনাটা সেরে নিয়ে হৃষীকেশবাবু নিজেই হেসে উঠলেন। আর-কেউ হাসলো না। সুমন্ত্র একবার ঢোঁক গিললো। লাল হ'য়ে উঠলো তার মুখ।

'কাল সকালবেলা নাপিত আসবে, চুলগুলো একটু ভদ্রলোকের মতো ক'রে নিস্।'

সুমন্ত্র একটা লম্বা নিঃশ্বাস নিয়ে বললে, 'মাথা কামিয়েও ফেলতে পারি, যদি বলো।'

'কোথায় শিখিস্ এ-সব আজগুবি ফ্যাশান ! মাথা তো নয়, কাকের বাসা একটা। তাও বুঝি তেল দিস্না মাথায় ?

'তেল দিলে আমার মাথা ধরে।'

'তা তো ধরবেই। সব খাস্ সাহেব এসেছিস কিনা বিলেত থেকে। বিলিতি ঢং করতে গিয়ে ঐ তা রোগা পট্কা শরীর করেছিস। আর দ্যাখ তো আমাদের স্বাস্থ্য—এই বয়সেও—'

মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বললে অরুণা—'এই বয়সেও কী রকম খেতে পারি। সেটা আর মুখে বলতে হবে না বাবা, উপস্থিত প্রত্যক্ষই দেখা।

'এ-বয়সে তোদের বুঝি আর খুঁজেও পাওয়া যাবে না। শিখেছিস কেবল অন্যের নকল করতে। আর শিখেছিস', ছেলের দিকে বক্র দৃষ্টিতে

তাকিয়ে হৃষীকেশবাবু জুড়ে দিলেন, 'কিছু বললেই প্যাঁচার মতো মুখ করতে।' শেষের কথাটাতে যে-আপোশের ইঙ্গিত নিহিত ছিলো, সুমন্ত্রর উপর তা কোনরকম কাজ করেছে, এমন বোঝা গেল না। সে রইলো মাথা নীচু ক'রে, মুখটা চাপা উত্তাপে জমাট।

বিজয়া যখন দ্বিতীয় প্রস্থ মাছ নিয়ে ছেলের কাছে এলেন, সুমন্ত্র বললে 'আর খাবো না মা!'

'আর খাবি না, সে—কী। কিছুই তো খেলি না।'

'রান্না সম্বন্ধে তোমাদের উৎসাহের সীমা-থাকতে পারে, কিন্তু মানুষ যা খেতে পারে, তার তো একটা সীমা আছে।'

'কী খেলি? এরই মধ্যে পেট ভ'রে গেল?

'খুব ভরেছে, মা। খুব খেয়েছি। চমৎকার হয়েছিলো সব।'

সত্যি—এতদিন হস্টেলের রান্নার পর যা-কিছু মুখে দিয়েছে সে, সবই অমৃতর মতো লেগেছে।

'একখানা ইলিশ মাছ খা, সর্ষে দিয়ে রেঁধেছি।'

'না-না, আর পারবো না।'

হৃষীকেশবাবু গলা খেঁকারি দিয়ে ব'লে উঠলেন, 'কোত্থেকে পারবে। দিন-রাত খালি চা। অত চা খেলে কি কারো ক্ষিদে থাকে?'

'তুমি আর বোকা না তো,' স্বামীর দিকে কটাক্ষপাত ক'রে বিজয়া বললেন। তোমার জ্বালায় ছেলেটা ভালো ক'রে খেতেই পারলে না। আজই তো সবে এসেছে—বাড়িতে পা দিয়েই এ-সব বাজে বকুনি শুনতে কার ভালো লাগে!'

'থাক-থাক, আর কিছু বলবো না তোমার ছেলেকে। আমার অর্ধেকও ও খেতে পারে না, এটা দেখে দুঃখ হয়—মনে দুঃখ হয়।'

'যে যত বেশি খেতে পারে, সে-ই তো ততো বড়ো মহৎ মানব,' মুখ টিপে হেসে বললে অরুণা।' 'দাদা যখন খাবেন না, মাছগুলো সব বাবার পাতেই দাও মা।'

'খাবে না কী! খেতেই হবে ওকে। ওর মা নিজে গিয়ে রাঁধলেন, আর উনি এখন খাবেন না! এ কী-রকম অসভ্যতা!'

সুমন্ত্র আর প্রতিবাদ ক'রে একখানা মাছ গ্রহণ করলো। পিতৃদেবের

সঙ্গে তর্ক করার চাইতে খেতে-খেতে কেটে যাওয়াও বোধ হয় ভালো—এমনি মনে হয় তার।

'হস্টেলে খেতে-টেতে দেয় কেমন?' জিগ্যেস করলেন বিজয়া।

'কেমন আর—'

মন্তব বুঝি ভালো ক'রে একদিনও পেট ভরে না, কেমন ক'রে উঠলো বিজয়ার মন।

বললে—'ভালো লাগে ও-সব খেতে?'

'কী যেন। খেতে হয়, নাই।'

এতক্ষণ অশোক কথা বললে, 'হস্টেলে থাকতে-থাকতে অভ্যাস হ'য়ে যায়। খাওয়া খারাপ, কিন্তু সে-কথা তখন মনে থাকে না!'

'কত যেন কষ্ট হয় ছেলেগুলোর।'

'কেন, কষ্ট হবে কেন?' ব'লে উঠলো সুমন্ত্র।

অশোক বললে, 'হস্টেলের ছেলেরা বেশ ফুর্তি ক'রেই থাকে তো দেখি। আড্ডা, হৈ-চৈ, হুল্লোড়—'

'হ্যাঁ, ছেলেগুলো আড্ডা পেলেই সব ভুলে থাকে।' বিজয়া ঘুরে এসে অশোকের পিছনে দাঁড়ালেন। বললেন—'তোমাকে আর-একখানা মাছ দিই, অশোক?'

তাঁর কর্ণগোচর কোনো প্রসঙ্গের আলোচনা হ'তে থাকলে হৃষীকেশবাবু পক্ষে তাতে যোগ না-দেয়া অসম্ভব। ইলিশের সর্ষে দিয়ে তিনি ভাত মাখলেন, তারপর বললেন, কষ্ট! হস্টেলের ছেলেদের কষ্টের কথা বলছো নাকি? আরে, তারা তো রাজার হালে থাকে। যে-যা পাবে আদায় ক'রে নেয় বাপের কাছ থেকে—তারপর মহা ফুর্তি! যা তারা চায় তা-ই পায়; যা তাদের খুশি তা-ই করে। কষ্ট ছিলো আমাদের সময়ে। ষোলো বছর বয়সে আমি ঢাকা কলেজে পড়তে আসি। কোথায় তখন রাজপ্রাসাদের মতো এই সব হস্টেল! লক্ষ্মীবাজারের এক মেসে আমার বাসা। এক ঘরে পাঁচজন ক'রে থাকি। মেসের খরচ মাসে তিন টাকা—

এই কাহিনীতে অশোক একবার বাধা দিলে, তা তিন টাকা কম কী তখনকার দিনে।'

ও-রকম ক'রে আজকালকার কোনো ছেলে থাকতেই পারবে না! বাধা

পেয়ে কথার স্রোতে আরো তোড় লাগলো। 'কী আমরা খেতাম? ডাল-ভাত-আলুসেদ্ধ—আর কলেজ থেকে ফিরে এক পয়সার ছোলাভাজা। কেরোসিনের আলোয় তিনজনে মাথা-ঠেসাঠেসি করে পড়তাম—এক ঘণ্টার মধ্যে ধোঁয়ায় কালো হয়ে যেতো চিমনি। এমনি করেই আমরা পড়াশুনো করেছি, এমনি করেই পাশ করেছি! মাসে আট টাকা খরচ সবসুদ্ধ!'

এ-কাহিনী নিশ্চয়ই এত সংক্ষেপে শেষ হতো না যদি না মেটাতে হতো ঔদরিক দাবি।

'আট টাকা?' অশোক মৃদু মন্তব্য করলে, 'আর কলেজের মাইনে?'

'তিন টাকা—'

'আর দু' টাকা দিয়ে কী করতে, বাবা?' সরল কৌতূহলে জিজ্ঞেস করলে অরুণা।

'হাতখরচ। খাতা-পেন্সিল থেকে ধোপা-নাপিত সবই ওর মধ্যে। পারতে তোমরা কেউ?' অশোকের দিকে তাকিয়ে সগর্ব ভঙ্গিতে প্রশ্ন করলেন হৃষীকেশবাবু।

'পারতাম কি-না সেটা নিরূপণ করবার উপায় নেই তো,' একটু হেসে অশোক বললে—'অবস্থায় পড়লে সবাই সব পারে।'

'না-না, এখনকার ছেলেদের সে-রকম গ্রিট্ই নেই। আরামের কাঙাল সব, বিলাসিতার দাস। কী যে হবে এদের দিয়ে, আমি তো ভেবেই পাই না।'

'বেশি না ভেবে বাবা টম্যাটোর চাটনি খাও—' অরুণা বললে।

অশোক বললে, 'আজকাল দেশের অবস্থাই এমন হয়েছে যে, একটু ভালোরকম থাকা-খাওয়া অনেকেরই আয়ত্তের মধ্যে। কষ্ট করার দরকার হয় না আজকাল এবং বাধ্য না হলে কি কষ্ট করে কেউ।'

হৃষীকেশবাবু মাথা নেড়ে বললেন, 'না-না, কষ্ট না করলে কখনো কেউ মানুষ হয় না।'

অশোক খাওয়া শেষ করে এক গেলাস জল খেয়ে নিলে।

'বরং বলতে পারেন মানুষ হলেই তাকে কষ্ট পেতে হয়। থাকা-খাওয়ার কষ্টটাই তো মানুষের একমাত্র কষ্ট নয়। আর যাবতীয় কষ্টের মধ্যে সেটার কোনো মহিমাই নেই। মনুষ্যসমাজ থেকে সে কষ্টের উচ্ছেদ তো আজকের

দিনের প্রধান লক্ষ্য।'

অশোক তার কথাটা শেষ করতে পেরেছিল নেহাৎই মনের জোরে। যে-মুহূর্তে তার প্রথম বাক্যটি শেষ হয়েছিল, সেই মুহূর্ত থেকে হৃষীকেশবাবুর মুখে টগবগিয়ে উঠেছিল প্রতিবাদ। সেটা অগ্রাহ্য করে বক্তব্য সম্পূর্ণ করতে বেশ চেষ্টা করতে হয়েছিল অশোককে।

'ওসব বইয়ের বিদ্যে ছেড়ে দাও হে অশোক!' ডান হাত আহারে ব্যাপৃত বলে মাত্র বাঁ-হাতেরই একটা প্রবল ভঙ্গি করে হৃষীকেশবাবু বললেন —'বইয়ে-পড়া বিদ্যে কি আর জীবনে সব-সময় চলে।'

'জীবন নিয়েই তো সমস্ত বইয়ের কারবার।'

'না-না—'হৃষীকেশবাবু সশব্দে টম্যাটোর চাটনি চাখতে-চাখতে এ-বিষয়ে শেষ ও চরম কথা ঘোষণা করলেন, 'না-না, এ-যুগের ছেলেদের দিয়ে কিছু হবে না। কেবল আত্ম-সুখ, কেবল কষ্টের ভয়···চাটনিটা আর একটু দাও তো, বেশ হয়েছে।'

* * *

বাইরে পর্দার ফাঁক দিয়ে খাবার ঘরের আলোর একটা লম্বা হল্‌দে তীর বারান্দাকে দু'ভাগ করেছে। তাছাড়া অন্ধকার রাত; কালো আকাশে তারাগুলো ঝক্‌ঝকে। ঝিরঝিরে হাওয়া দিচ্ছে থেকে-থেকে—থমকে-থমকে। বাইরের দিকে তাকিয়ে অশোক কী ভাবছিল, টের পায়নি কখন অরুণা চুপি-চুপি তার পিছনে এসে দাঁড়িয়েছে।

'এই শোনো'—অরুণা ডাকলে চুপি-চুপি।

অশোক চমকে মুখ ফিরে তাকালো। আবছা আলোয় ভালো করে মুখটা দেখা যায় না। ফিকে নীলের উপর সাদা ডোরা-কাটা অরুণার শাড়িটা কেমন অদ্ভুত ঠেকছে এই আবছা আলোয়।

খানিকক্ষণ কেউ কিছু বললে না।

'পান খাবে?' আস্তে একটু কাছে সরে এলো অরুণা।

'দাও।'

অশোক হাত বাড়ালো। অরুণা তার মুঠো-করা হাতটা রাখলো অশোকের প্রশস্ত প্রসারিত হাতের উপর। সেখানে খানিকক্ষণ বিশ্রাম করলো তার ক্লান্ত হাত।

'তুমি পান সেজেছো ?' পান মুখে অশোক জিগ্যেস করলো।

'আগে বলো কেমন।'

'ভালো বলাটা মামুলি হয়ে গেছে। অন্য কিছু বলতে ইচ্ছে করে।'

'অন্য কিছু!' অরুণা প্রতিধ্বনি করলে আধো ঠাট্টার ঢঙে।

একটু চুপচাপ। হঠাৎ অরুণা কেমন মিনতির সুরে বললে—'আমার বাবাকে ঐ রকম মাথা-খারাপ মনে হয়—কিন্তু আসলে উনি খুব ভালো।'

'ও কথা বলছো কেন ?'

'অন্যকে কথা বলতে দেন না একেবারেই—এটা ওঁর মস্ত দোষ। আমারও রাগ হয় মাঝে-মাঝে।'

অশোক ক্ষীণ হাসলো, কিছু বললো না।

'কিন্তু ওঁনার যত চোটপাট সব মুখেই, মনে ওঁনার কিছু নেই।'

'তা আমি জানি।'

'তবু এক-এক সময় বড়ো বাড়াবাড়ি করেন। দাদা তো আজ রেগেই গেছে! তাতে কী—উপরে গিয়ে বাবা আবার পাকড়েছেন! এখনোও বক্তৃতা চলছে।'

অশোক আবার হাসলো, এবার একটু শব্দ করে। 'সেটা টের পাচ্ছি এখানে দাঁড়িয়েই। কানে আসছে গুমগুম আওয়াজ, কথাগুলো তলিয়ে যাচ্ছে। সেটা দুঃখের বিষয় কিছু বলতে পারি না।'

অরুণা হেসে উঠলো খুব জোরে নয়। বললো—'যত বয়স হচ্ছে, এ দোষটা বেড়েই চলেছে বাবার। ঠিক থাকেন এক মা'র কাছে।'

একটু চুপ করে অরুণা আবার বললে—'আমার মা কিন্তু খুব ভালো।'

'তাও আমি জানি।'

আবার একটু চুপচাপ। খুব নীচু গলায় অরুণা বললে, 'অন্যদের সামনে একেবারেই কোন কথা বলা যায় না। ভারী মুশকিল।'

'অন্যদের সঙ্গে কথা বলা যায়, সেটাই বাঁচোয়া!'

'কথা বলতেই হয় নয়তো—'

'নয় তো' ?

'কে জানে কে-কী মনে করবে!'

অশোক গম্ভীর হয়ে গেলো। ঘাড় ফেরালো অরুণার মুখ ভালো ক'রে

দেখার জন্যে। অরুণার গালের উপর একটি স্খলিত অলক এসে পড়েছিলো, সেদিকে তাকিয়ে চুপ ক'রে রইল সে। একটু পরে বললে, 'কেউ কিছু মনে করে নাকি?'

'এখনো করে না।'

'পরে হয়তো করবে?'

'সেটাই ভেবে রাখা ভালো।'

অশোক বেশ কিছুক্ষণ চুপ ক'রে রইলো। তারপর বললে,—'তা-তো ভেবেই রেখেছি। সমস্তটাই ভেবেই রেখেছি।'

ধ্বক্ ক'রে উঠলো অরুণার বুকের ভিতরটা। এক দীর্ঘ মুহূর্ত দু'জনে দু'জনের দিকে তাকিয়ে রইলো। কারোরই পলক পড়ে না।

'এখন দাদা এলেন'—চোখ নামিয়ে অরুণা বললে!

'হ্যাঁ, সুমন্ত্র এসেছে। ভালোই তো।'

'দাদা তো বুঝতে পারবেন দু'দিনেই।'

'তা—তো পারবেই।'

'না—না', হঠাৎ অরুণা বলে উঠলো।

'কী? কী—না?'

'কেউ যেন না বোঝে। কেউ যেন কিছু মনে না করে।'

'এ-খেলা যখন খেলছোই; সমস্তটাই মেনে নিতে হবে।'

'খেলা!' অরুণার মস্ত একটা নিঃশ্বাস পড়লো।

'সম্পূর্ণ রূপক অর্থে,' অশোক হাসলো। 'অত ভয় পেলে চলে? হয়তো এমন কাণ্ড হবে—'

'তা-তো হতেই পারে—শেষ পর্যন্ত।'

একটু এদিক-ওদিক তাকিয়ে খুব দ্রুত স্বরে বলতে লাগলো অরুণা, 'শোনো, তুমি না-হয় না এলে কিছুদিন। না—না, হঠাৎ না-আসাটাও চোখে পড়বে—চ'লে যাবে কোথাও কিছুদিনের জন্য?···পাগল! কী-সব যা-তা বলছি, কিছু মনে করো না।'

নিজের কথার খেই হারিয়ে অরুণা ভাঙা-ভাঙা গলায় হেসে উঠলো।

'হঠাৎ তুমি এমন চমকালে কেন?'

'এসো আমরা খুব সহজ হই লোকের সামনে। খুব হাসিখুশি, খুব

খোলামেলা, খুব সাধারণ।'

'বরং এসো আমরা একদিক তুমুল ঝগড়া করি। তারপর থেকে কেউ কাউকে দেখতে পারবো না ; আমার নাম শুনলেই তুমি কপাল কুঁচকোবে, তোমার কথা উঠলেই আমি মুখ-ভার করবো—বাড়ির লোকেরা ব্যস্ত হ'য়ে উঠবেন আপোশের চেষ্টায়।'

অশোক আধো ঠোঁট খুলে একটু হাসলো! অরুণার চোখেও হাসির ঝিলিক লাগলো, কিন্তু পরমুহূর্তেই গম্ভীর হ'য়ে গিয়ে সে বললো, 'কী হয় জানো? এই তো দাদা এসেছেন, তাঁর সামনে তোমার দিকে তাকাতেই আমার ভয় করে। মনে হয়, ধরা প'ড়ে যাবো।'

'গেলেই বা!'

'ভয় করে, ভয় করে আমার,' নিঃশ্বাসের স্বরে অরুণা বললো।

'কতবার তোমাকে বলেছি ভয় নেই! কোনো ভয় নেই,' অরুণার কানের কাছে মুখ নিলো অশোক। পলকের জন্যে লাগলো তাঁর ঠোঁটে অরুণার কানের উপরকার চুলগুলোর রেশমস্পর্শ। সঙ্গে-সঙ্গে অশোক স'রে গেলো, যেন ভয় পেয়ে।

'আমার এক-এক সময় মনে হয় কী জানো?' একটু চুপ ক'রে থেকে অরুণা বলতে লাগলো, 'মনে হয়, এই তো বেশ আছি আমরা, এই তো বেশ আছি। এখনো আড়াল আছে, আমরা আছি ছায়ায় লুকিয়ে। যে-মুহূর্তে ছায়া স'রে যাবে, সে-মুহূর্তে উঠবে ঝড়!'

'সইতে পারবে না?'

'এখনই কি ক'বে বলি? হয়তো পারবো। কিন্তু যদি না পারি?'

অশোক জুতোর শব্দ না-ক'রে কয়েক পা হেঁটে ফিরে এসে অরুণাকে বললো—'একটা কথা। আমাকে ঠিক বিশ্বাস করো তো তুমি?'

'তোমাকে! বিশ্বাস করি!' অস্ফুট শব্দে হেসে উঠলো অরুণা।

'না, বলো। আজ সময় হয়েছে।'

অরুণা তার তরল কালো চোখে তাকিয়ে বললে, 'কী তুমি শুনতে চাও আমার কাছে?'

'বলো। আমাকে অভয় দাও, শক্তি দাও আমাকে।'

'আমি! আমি অভয় দেবো!'

'তুমি! তুমিই তো! তোমার মধ্যেই তো আমার শক্তির উৎস—' তোমার অঙ্গীকারেই আমার নির্ভর। এই যে ছাখো যুগে-যুগে, দেশে-দেশে পুরুষের এত শক্তি, এত সাহস, তার মূল কোনখানে? কোন কালো চোখের অন্ধকারে?'

'অমন ক'রে বোলো না তুমি, অমন ক'রে বাড়িয়ো না আমাকে। যদি জানতে আমি কত ছোটো, কত দুর্বল!'

'যদি জানতে তোমার ঐ ছোটো হাতে কত শক্তি! সে-কথা যাক। আমাকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করতে পারো কিনা বললে না তো।'

'সে-কথা জানতে চাও? তুমি বোঝো না?'

'তবু বলো। মুখ ফুটে বলো।'

অশোকের চোখের দিকে তাকিয়ে মুগ্ধের মতো ব'লে উঠলো অরুণা, 'পারি-পারি।'

'আর আমাকেই কি তুমি চাও মনে-প্রাণে?'

'চাই, তোমাকেই আমি চাই।'

'খুব বেশি ক'রে চাও? পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বেশি ক'রে?'

'সমস্ত পৃথিবীর মধ্যে তোমার মতো আর-কিছুই চাই না আমি।'

'সব ছাড়তে পারো আমার জন্য? তোমার এই বাড়ি, তোমার ভাই-বোন-মা-বাবা?'

'পারি ছাড়তে। এই বাড়ি, আমার ভাই-বোন-মা-বাবা।'

'বলো, আরো বলো। বলো আমাকে, তোমার হাত ধরে বেরিয়ে পড়তে পারি হতাশার রাজপথে, পথ হারাতে পারি দুঃখের অরণ্যে, তোমার সঙ্গে যেতে পারি মৃত্যুর সিংহদরজা পার হ'য়ে।'

'তুমি নাও আমাকে, আমাকে নিয়ে চলো যেখানে তোমার খুশি। তোমার সঙ্গে আমি বেরোবো হতাশার পথে, যাবো দুঃখের মুখে, পার হ'য়ে যাবো মৃত্যুর দুয়ার।'

হঠাৎ একটা হাওয়ার ঝাপটা উঠলো, বাইরে গাছের পাতায়-পাতায় বাজলো দীর্ঘশ্বাস! শিউরে উঠলো দু'জনেই। যেন একটা ঘুম ভাঙলো, একটা মোহ গেলো কেটে। চোখে-চোখ দু'জনে হেসে উঠলো একসঙ্গে।

'কী-সব যা-তা বলছিলাম,' অরুণা বললে।

'আমাকে যেতে হবে, অনেক রাত হ'লো'—বললে অশোক।

'এখন ক'টা ?'

অশোক অন্ধকারে তার হাত-ঘড়ির জ্বলজ্বলে কাঁটার দিকে তাকিয়ে বললে, 'দশটা—প্রায়। সুমন্ত্র কোথায় ?'

'এখনই নামবে উপর থেকে, এখানেই দাঁড়াও। বাবার হিতোপদেশের ঝড় শেষ হোক।'

'ঝড়টা একদিন তোমার দিকেও আসতে পারে,' অশোক হেসে বললে 'প্রস্তুত থাকো।'

'আমার মা-বাবা খুব ভালো' অরুণা কথাটা এমনভাবে বললো যেন তার নিজের ভিতরকার কোনো দ্বিধার খণ্ডন করছে।

'বার-বার বলছো কেন ও-কথা ? জানো তো, আমাদের জাতে মেলে না।'

বলা হ'লো কথাটা যে-কথাটা এতক্ষণ ধ'রে প্রেতের মতো তাদের মাঝখানে, এতদিন ধ'রে দাঁড়িয়ে আছে। অশোক উচ্চারণ করলে তা। যেন এই অদৃশ্য প্রেতের ছায়া সে আর সইতে পারছে না, যেন সেটাকে কথায় স্পষ্ট মূর্তি দিয়েই সে ভূত ছাড়াতে চায়।

'তোমার—আমার জাত আলাদা,' অশোক বললে ঠোঁট বেঁকিয়ে।

'তাতে কী ?' যেন খানিকটা জোর ক'রে অরুণা বললো। 'আজকাল তো এ-রকম কত হচ্ছে—'

'হচ্ছেই তো।'

'তোমার মা-বাবা কেমন ?' হঠাৎ অরুণা জিগ্যেস করলে।

'ওঃ, আমার জন্যে কিছু ভেবো না।'

'তাঁরা কি···তাঁরা কি আমাকে নেবেন না ?' কথাটা বলতে অরুণার গলা বুঁজে এলো।

'খারাপটাই ভেবে রাখা ভালো, আশাভঙ্গের কষ্ট তো হবে না।'

একটু ম্লান হ'য়ে গেলে অরুণা।

'অত ভাবছো কেন ?' অশোক বললে। 'আমি কি যথেষ্ট নই ?'

'আমিই কি তোমার পক্ষে যথেষ্ট হবো ? তোমার অত লোকসান কি ভরবে আমাকে দিয়ে ?'

কথাটা শুনে অশোক নীচু গলায় হাসতে লাগলো। বললো—'আমি কোনো আশা রাখি না, সুতরাং আমি নির্ভয়। যে-মস্ত জিতের আশা করছি, সেটা যদি হয়, অন্য পক্ষে কতখানি লোকসান হ'লো, তা হিসেব করবার ফাঁক থাকবে না। কিছু ভাঙচুর হবেই—সে তো জানা কথা।'

অরুণা মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললে, 'কী সহজে বললে তুমি কথাটা।'

'তাছাড়া,' সাধারণ কথাবার্তার সুরে অশোক বললে, 'আমার পারিবারিক জীবন তো জানো।'

'মা প্রায়ই বলেন তোমার কথা—আহা, মা নেই।'

'আমার মা নেই! আমার যাতে মা থাকে, সে-জন্যে আমার···বাবা তিন-তিন বার বিয়ে করলেন!'

'অমন করে বলো না তুমি। কষ্ট লাগে!'

'আমি তো এতে কিছু কষ্ট দেখতে পাই না।'

'জানি-জানি, সবই জানি তোমার। কখন স্নান, কখন খাওয়া, কিছুরই কি ঠিক আছে! ঘুরে তো বেড়াও সারাদিন আড্ডা দিয়ে, রাত্রে কখনো বারোটায় ফিরলে, কখনও বা বন্ধুর সঙ্গে শুয়েই কাটিয়ে দিলে, জানি না তোমাকে!'

'এ-ই তো ভালো! এই রকম জীবনই তো ভালো।'

'কেউ কিছু বলে না। কী করিস, কে'থায় থাকিস, ফিরতে এত রাত হয় কেন, কিছু না। এটা যে কী চমৎকার লাগে, বলতে পারি না। আর-কিছুর জন্য না হোক, এর জন্য বাবার কাছে আমি গভীরভাবে কৃতজ্ঞ।'

'কী যে বলো! তাহ'লে আর স্নেহ-মমতার অর্থ কী?'

'স্নেহ-মমতার অর্থ যে কী, তা নিয়ে তোমার-আমার চেয়ে অনেক বড়ো-বড়ো মাথাওলা লোকেরা সম্প্রতি গবেষণা করছেন। আমি এটুকু বলতে পারি যে স্নেহ-মমতার পাওনাদার যদি এগারোটি সন্তান হয়, তবে শেষ পর্যন্ত ইনসলভেন্সি নিতে হয়, তাছাড়া উপায় থাকে না!'

'অমন ক'রে কথা বলো কেন তুমি? ও-জিনিসগুলোর কি কিছু মূল্য নেই?'

'আমার পক্ষে যে নেই, তা-তো তুমি দেখতেই পাচ্ছো। যে যার মন নিয়ে থাকুক, এ-ই তো আদর্শ অবস্থা। এর ব্যতিক্রমই অসহ্য!'

'তুমি যে-রকম বলছো, তোমার মা-বাবার সঙ্গে দিনে একবার হয়তো তোমার দেখাও হয় না ?'

'কখন হবে ? কেমন ক'রে হবে ? মা-বাবা থাকেন দোতলায়, আমি একতলায়। কখনো-কখনো যেতে-আস্তে বাবার সঙ্গে দেখা হয় বাড়ির সামনেকার রাস্তায়।'

স্তম্ভিত, ব্যথিত হ'য়ে অরুণা তাকিয়ে রইলো অশোকের মুখের দিকে। সে-দৃষ্টি লক্ষ্য ক'রে অশোক বললে, 'এত অবাক হচ্ছো কেন ? মা-বাবার সঙ্গে দেখা হ'য়েই বা কী হবে ? কী কথা বলবো আমি তাঁদের সঙ্গে ? তাঁদের সঙ্গে আমার কোথায় মিল ?'

'মা-বাবার সঙ্গে তোমার মিল নেই !'

'ও, হেরিডিটি ! সে-মিল তো নাকের ছাঁচ বা মাথার টাক বা অমনি কতগুলো তুচ্ছ শারীরিক মুদ্রাদোষে আবদ্ধ। তার মানেই তো এ নয় যে মনের দিক থেকে কোনো সংযোগ আছে। যে-সংযোগটা খুব প্রত্যক্ষ, সেটা হচ্ছে আর্থিক। দুঃখের বিষয়, বাবার কাছে এখনো মাঝে-মাঝে টাকা চাইতে হয়। সুখের বিষয়, তিনি চাইলেই টাকা দেন।'

'তুমি তো টিউশনি করো, করো না ?'

'করি। এই আর্থিক সংযোগটুকু একবার ছিঁড়তে পারলেই আর ভাবনা থাকে না।'

'ছি-ছি, যে বাপে-ছেলেতে নেহাৎই টাকাব সম্পর্ক।'

অশোক হেসে বললে, 'তুমি জানো না, এই টাকার সম্পর্কটা একবার ঘোচাতে পারলে পিতা-পুত্রে হয়তো একটা সত্যিকারের সম্বন্ধ স্থাপিত হ'তেও পারে।'

'তোমার এ-সব কথা আমি ভালো বুঝি না। শুনতেও ভালো লাগে না !'

'থাক্ তবে, আর না বললাম। আর সব-শেষের কথা হচ্ছে এই যে—'

কিন্তু কথাটা বলা হ'লো না। পিছনে শোনা গেলো সুমন্ত্র'র স্যাণ্ডেলের ফটাফট্ আওয়াজ। খুব সহজ সুরে অরুণা বললে, 'তা'হলে সেই বইটা আনতে ভুলো না, অশোকদা।'

অশোক বললে, না 'ভুলবো না—'

সুমন্ত্র অশোককে রাস্তায় একটু এগিয়ে দিতে গিয়ে বললে, 'একটা কথা,

অশোক। আমার বাবার সঙ্গে তুমি তর্ক করো কেন?'

'অভ্যাসের দোষ, বলতে পারো।'

'ভবিষ্যতে আর করো না। আমার বাবার সঙ্গে যে তর্ক করে সে হয় নির্বোধ নয়…'

'…নয়?'

'নয় সে আমার বাবার মতোই অন্য একজন। তর্ক তার সঙ্গেই চলে, যার সঙ্গে মোটামুটি মেজাজে মেলে। যার সঙ্গে একেবারে কিছুই মেলে না, তার কথা চুপচাপ শুধু শুনে গিয়ে যেতে হয়—তারপর ভুলে যেতে হয়।'

সুমন্ত্র একটু ভেবে বললে, 'নয়তো কাজে অন্য রকম দেখাতে হয়।'

* * *

'আর সব শেষের কথাটা হচ্ছে…কী?' মাথার নীচে হাত রেখে শুয়ে অরুণা চেষ্টা করলো ভাবতে। এত কথা বলা হ'লো, তবু কিছুই বলা হ'লো না। কোন কথা তারা বলতে চেয়েছিলো, এত প্রশ্নে, এত উত্তরে, এত নিরুত্তরে? কোন কথা তারা বলতে চায়, এত বলায়, এত না বলায়? সব কথাব পর সবশেষের কথাটা হচ্ছে…কী?

পাশ ফিরে শুলো অরুণা। বড্ডো গরম। ঘুম আসে না। এক-এক রাত্রে ঘুম আসতে চায় না, কী যেন হয়। জানে, কী হয়। খাটের গা ঘেঁসে তার ছোটো টেবিল, তার উপর টিক্‌টিক্ কবছে ছোটো চৌকো টাইমপিস। টিক্-টিক্, টিক-টিক। ক'টা বাজলো? হয়তো দেড়টা, হয়তো মোটে বারোটা। তার মনে হচ্ছে, অনেকক্ষণ ধ'বে সে শুয়েছে, অনেকক্ষণ ধ'রে সে শুয়ে আছে…কিন্তু আলো জ্বেলে ঘড়ি দেখলে হয়তো দেখবে আধ ঘণ্টাও হয়নি। তোমার সঙ্গে যাবো হতাশার রাজপথে, দুঃখের মুখে, মৃত্যুর দরজায়। যাবো, যাবো আমি! যাবো তোমার সঙ্গে দুঃখের গুহায়, নির্জন অরণ্যে। কথাগুলো কেমন অদ্ভুত, অদ্ভুত প্রতিধ্বনি তুলে গুমরে ফিরছে বুকের মধ্যে। অর্থ থেকে বিচ্ছিন্ন, এ যেন একটা অশরীরী অস্পষ্ট স্বরে রাত্রির বুকের ভিতর থেকে উঠে এলো। সেই স্বরের স্পর্শে কাঁপছে অরুণার বুক। একটা স্বর…আর কিছু নয়। কোন রহস্যময় ধ্বনি, এই অন্ধকার তার প্রতিধ্বনিতে উল্কি-আঁকা। দুঃখের দরজায়, নবজন্মের সিংহদ্বারে। অরুণার হৃৎস্পন্দনে তারই প্রতিধ্বনি!

হয়তো ভালোই হবে শেষ পর্যন্ত—যদি সব ছাড়তে হয়। ছোটো একটা বাড়ি কোনোখানে—যেখানেই হোক। কী মানুষের দরকার? সবচেয়ে বড়ো প্রয়োজন মানুষের কোনটা? বড়ো ভয় নাকি খেতে না-পাওয়ার, সেই ভয় দেখানোটাই শাসনের সবচেয়ে বড়ো অস্ত্র। কিন্তু কত আর খেতে পারে মানুষ, কত আর ভালো লাগে তার। আই-এ পাশ করলেও সে-ও পারবে একটা মাস্টারি জুটিয়ে নিতে। ছোটো বাড়ি···সে রান্না করবে। হায় রে, সে-তো এ-পর্যন্ত কোনোদিন রান্নাঘরে ঢোকেনি, কী দিয়ে কী হয়, কিছুই জানে না। ওঃ সব পারবে সে, সব পারবে, মানুষ কী-না পারে, কী-না পেরেছে যখন তার জীবনের সব চেয়ে বড়ো প্রয়োজন পূর্ণ হয়। ছোট একটি বাড়ি, টবে দু'-একটা চারাগাছ।

সেই অন্ধকারে তাকিয়ে রইলো অরুণা, আবছায়া ঘরের দিকে তাকিয়ে। এ-ঘর তার। সকালবেলা ঐ টেবিলে সে পড়তে বসে। পূবের জানালা দিয়ে উঁকি দেয় ঝিলিমিলি রোদ। বিকেলে কতদিন জানালার ধারে ব'সে আনমনা হ'য়ে, চুল বাঁধতে ভুলে যায়। কোনো বন্ধু এলে এই ঘরেরই দরজা বন্ধ ক'রে কত প্রশ্ন, কত গোপন কথা।

'ওরে তোরা খাবি না?' ডাকতে-ডাকতে মা'র গলা ভেঙে যায়। রাত্রে এই খাটেই শোয়া—বালিশে যেই মাথা ছোঁওয়ানো, অমনি ঘুম। বন্ধুর কাছ থেকে দু'-দিনের কাড়ারে উপন্যাস এনে তোড়জোড় ক'রে পড়তে শুরু করেছে শুয়ে-শুয়ে, কখন ঘুমিয়ে পড়েছে মনেও নেই। মা এসে আলো নিভিয়ে গেছেন। মা'র কত খেয়াল। কখনো কিচ্ছু ভোলেন না। শোবার আগে রোজ একবার সবগুলো ঘর তাঁর দেখে যাওয়া চাই।

মা'কে সে খুব ভালোবাসে। বাবাকেও। খুব-খুব। তাঁদের ছাড়তে হবে; ছাড়তে হবে এই বাড়ি, এই তার ঘর। এখানে কোনো অভাব নেই, এখানে সুখ, না-চাইতেই এখানে সব পাওয়া যায়। এইখানে একাও নির্ভরের নির্ভাবনা। সব ছাড়তে হবে। যেতে হবে দুঃখের পথে, হতাশার অরণ্যে। হয়তো দুঃখ-হতাশা-ব্যর্থতা। কী ঐ কথাগুলো, কী মানে ওই কথাগুলোর? ভাবতে বুক ভ'রে ওঠে। ঐ তো তার নিজের জীবন, তার জীবন সে নিজের হাতে নেবে। বাবা তো এই কথাই বলেন। তার মা-ও কি একদিন আসেননি, এমনি সব ছেড়ে, সব ভুলে গিয়ে? তারপর দু'হাতে

রচনা করেছেন নিজের জীবন। মা'র তো মা-বাবা আছেন, তাঁরা এখন কোথায়? একবার দেখাও হয় না, মনেও পড়ে না। তারও কি এমনি হবে? এরই জন্য কি মেয়েদের জন্ম।

টনটনিয়ে উঠলো অরুণার বুক। মনে পড়লো অশোকের পারিবারিক জীবন। ও বোঝে মা, ও জানে না। দাদাও যেন কেমন। ছেলেরা কি এমনি হয়? ওদের কী, ওদের তো আর ছেড়ে যেতে হয় না। তাই ওর অত সহজেই বলতে পারে—'চাই না ও-সব। অমন কথা কি কোনো মেয়ের মুখে দিয়ে বেরোতে পারে কখনো! সে-যে জানে একদিন, তাকে ছাড়তেই হবে সব, অত মায়া তো তার সেইজন্যেই।'

'মেয়ে পর'—বাবা তো খেতে ব'সেও একবার বললেন, বাবা প্রায়ই বলেন কথাটা। 'পর' কথাটা শুনতে কী বিশ্রী, ভাবতে কী নিষ্ঠুর। কিন্তু এ-কথা বাবা-মা জানেনই মনে-মনে। মেয়ে নিজেও কি আর মনে-মনে জানে না? যা-ই বলো না, আমি তো কেবল অমুকবাবুর মেয়ে নই, আলাদা একটা মানুষ। আমি-আমি। কথাটা ভাবতে অরুণার রোমাঞ্চ হ'লো। আছে আমার নিজের একটা জীবন, সেই জীবনের আছে পূর্ণতার আশা। তোমার সঙ্গে আমি যাবো দুঃখের পথে, হতাশার নির্জনতায়।

এমনি হয়েছে তার মা-র, চিরকাল কত কোটি-কোটি মেয়ের জীবনে। এমনি হবে। সেই-যে একটা মুহূর্তে এসে জন্মের সমস্ত গাঁটগুলোকে নির্মম-ভাবে ছিঁড়ে বেরিয়ে যাওয়া—শরীরের সমস্ত শিরা-উপশিরা অন্ত্রতন্ত্র কি ব্যথায় ঝনঝন ক'রে বেজে ওঠে না? এ-কষ্ট ওরা কেমন ক'রে বুঝবে, ওদের তো ছাড়তে হয় না কিছু। তবু—মেয়ে যখন বিয়ের পর স্বামীও সঙ্গে চলে যায়, তখন কি কেউ কাঁদে বলো, কেউ কি কাঁদে তখন? কাঁদে। কিন্তু সে কান্না কি কেবলই দুঃখের আর বিচ্ছেদের, সে-কান্না কি নিস্পন্দ আনন্দেরও নয়, মিলনেরও অশ্রু কি নয় সেটা?

মা-বাবা সম্প্রতি তার বিয়ের জন্য ব্যস্ত হ'য়ে উঠেছেন। আভাসে ইঙ্গিতে টের পায় সে। চলেছে লোক-পরম্পরায় খোঁজাখুঁজি-বলাবলি। ছেলে পাওয়া যাচ্ছে না মনের মতো। এ কী বিশ্রী উপায় বিবাহের, হাজার কথা-কাটাকাটি, কিছু মিথ্যে, কিছু ভান, যেমন ক'রে লোকে ব্যবসা করে, তেমনি। আর যে দু'জন মানুষকে নিয়ে এত কাণ্ড, তারা লুডো খেলার

গুটির মতো আঙুলের টোকায় চালিত হ'য়ে কোনো রকমে এসে পৌঁছয় বিবাহরূপ স্বর্গে। এ-প্রথা বাল্যবিবাহের, বাল্যবিবাহের এটাই উপায়। কিন্তু সাবালক পরিণত মানুষদের নিয়ে যখন কারবার, তখন এটা শুধু যে অকেজো তা নয়, নিদারুণ অপমানের।

সে দিতে পারে বাঁচিয়ে তার মা-বাবার দুর্ভাবনা, এত সব ঝকমারি! এগুলো সুখের কথা নয়, এগুলো এড়াতে পারলে কে না খুশী হয়। সে নিতে পারে নির্বাচন ক'রে তার নিজের···কথাটা অরুণা মনে-মনেও উচ্চারণ করতে পারলে না। মা-বাবা কি খুশী হবেন না? এর চেয়ে ভালো আর কী হ'তে পারে? দু'হাত ভ'রে কি আশীর্বাদ করবেন না তাকে—তাদের দু'জনকে? যে-দু'জন মনে-মনে পরস্পরকে অঙ্গীকার করছে, তারা যখন মেলে, কত সহজ সেটা, কত সুন্দর।

এত বোঝেন তার মা-বাবা, এটা বুঝবেন না? এত ভালোবাসেন তাকে তাঁরা, আর তার জীবনের সবচেয়ে গভীর প্রার্থনাকে কি ব্যর্থ হতে দেবেন? তা কি হ'তে পারে?

অরুণা চোখ বুঁজলো শক্ত ক'রে, চেপে-ধরা অন্ধকারে অসংখ্য লাল-নীল বেগুনি ফুটকি ফুটে উঠলো। অন্ধকারের মধ্যে এত রং আসে কোত্থেকে? থেকে-থেকে আবার বদলায়, যেন রঙের ঢেউয়ে-ঢেউয়ে মেশামেশি, তারায়-তারায় কাটাকুটি। তা কি হ'তে পারে? তা-ই যদি সম্ভব হয়, তাহ'লে এই যে আমরা বলি মা-বাবার স্নেহ, তার মানে কী?

'স্নেহ-মমতার মানে কি'—তোমার আমার চেয়ে অনেক মাথাওলা বড়ো-বড়ো লোক সম্প্রতি গবেষণা করেছেন। আমি এটুকু বলতে পারি'।

অশোকের স্বর বেজে উঠলো তবে কানের কাছে, স্পষ্ট হ'য়ে। বাতাসে ভাসছে, সেই লঘু, শান্ত স্বরে, তাতে ঈষৎ হাসির রেশ যেন লেগেই আছে। যেন ঘন কুয়াশা পার হ'য়ে এসে লাগছে, সুরটা ধরা পড়েছে, কথাগুলো বোঝা যাচ্ছে না। একটা স্বপ্নের মতো হ'য়ে উঠলো, যার মধ্যে আমি নিজে কথাগুলো তৈরী ক'রে অন্যের মুখে চাপাই। এই যে দীর্ঘ অস্পষ্ট মর্মর, এ তো অরুণারই মন থেকে উৎসারিত হচ্ছে, কিন্তু বেজে উঠছে অশোকের স্বর।

অশোককে কথা কওয়াচ্ছে অরুণা, তার নিজের কথা দিয়ে। বলো-বলো, কিছু বলো আমাকে; ঘুমের আগে আমাকে কিছু বলো।

পরের দিন রবিবার। রোজ তাড়াহুড়ো ক'রে খেতে হয় এগোরোটার মধ্যে, অপেক্ষাকৃত সংক্ষেপে; আজ তার প্রতিশোধ। বহুল ও বিচিত্র ভোজ্য-সংবলিত দীর্ঘ ভোজ শেষ হতে-হতে গ্রীষ্মের দীর্ঘ বেলাও হাঁপিয়ে উঠলো। ভোজান্তে পরিপাটি বিছানা, ধবধপে চাদর মোটা-মোটা তাকিয়ায় আরামের আমন্ত্রণ। শিয়রে রূপোর ডিবের পান, পাশে জরদার কৌটা। তাকিয়ায় ঠেশান দিয়ে গোটা চার-পাঁচ পান একত্র ক'রে মুখে পুরে হৃষীকেশবাবুকে ডাকলেন, 'ওহে মন্তু!'

টুনকি বললে, 'দাদা নীচে।'

'এই না ওকে দেখলুম এখানে!'

'ডেকে আনব?' কিছু কাজে লাগবার আশায় ছোটো টুনকির চোখ নেচে উঠলো।

'আন। সারাক্ষণ ঐ নীচের ঘরটায় করে কী! আন ডেকে, যা। অরু-অরু কোথায় গেলি?'

উচ্চকণ্ঠ প্রতিধ্বনিত হ'লো অন্য প্রান্তে অরুণার ঘরে। হাতের বই ফেলে ছুটে এলো অরুণা।

'কী? কী বাবা?'

'তোর মা'কে একটু ডাক তো অরু।'

অন্যদিকের দরজা দিয়ে ঢুকে বিজয়া বললেন, 'ব্যাপার কী? চেঁচিয়ে যে বাড়ি মাথায় ক'রে তুললে এই দুপুরবেলা।'

'কোথায় থাকো তোমরা সব? দু'টো পান দাও।'

অরুণা হেসে বললে, 'তোমার ডিবেয় এখনো ভর্তি পান।'

মেয়ের দিকে তাকিয়ে হৃষীকেশবাবু হাসলেন।

'অরুণা, সেই তাস-জোড়া নিয়ে আয় তো।'

'তাস!' বিজয়া ব'লে উঠলেন। 'তাস দিয়ে কী হবে?'

'একটু খেলা যাক, এসো। আমি আর মন্তু। তুমি আর অরুণা। জেণ্টলমেন ভার্সাস লেডিজ্।' হৃষীকেশবাবু বলে হেসে উঠলেন।

'আমি এখন পারবো না বাপু ও-সব খেলতে,' বিজয়া আপত্তি করে বললেন—'একটু শুয়ে বাঁচি!'

'পারবে না কী? পারতেই হবে। নাও, ওঠো, ব'সে যাও।'

বালিশের স্তূপ সরিয়ে হৃষীকেশবাবু জায়গা ক'রে দিলেন।

'এসো না মা, খেলছি,' অরুণা সোৎসাহে বললে। 'বেশ হবে। অনেক-দিন খেলি না।'

ছুটে গিয়ে তার টেবিলের দেরাজ থেকে সে তাস নিয়ে এলো। মাথা ঝাঁকিয়ে বললে 'না, বাবা, আমি আর তুমি।'

প্রচণ্ড শব্দে তাস কেটে হৃষীকেশবাবু বললেন—'সেটি হবার নয়। আচ্ছা, তাহ'লে ব্রে খেলি, তোর মা-কে কেমন ব্রে করি ছাখ।'

'আহা—মাকে নিয়ে আবার খেলা! একবার ইস্কাবনের বিবি হাতে রেখে অন্য সব তাস ছেড়ে দিলেন, মনে নেই? তাস হাতে নিয়ে ব'সে বাজারের হিসেবের কথা ভাবলে কি আর খেলা হয়? তার চাইতে পিণ্টুকে নিয়ে বসাও ভালো।'

বিজয়া হেসে বললেন, 'হ্যাঁ, তা-ই ভালো, পিণ্টুকেই ডাক। আমি বাঁচি তাহ'লে।'

'না-না, ও-সব চলবে না,' আসনপিঁড়ি হয়ে ব'সে উৎসাহে উচ্চকিত কণ্ঠে হৃষীকেশবাবু ঘোষণা করলেন। 'অতটুকু ছেলে আবার তাস খেলবে কী! নাও, এসো। কোথায়, সুমন্ত্রবাবু কোথায়?'

বলতে-বলতেই সুমন্ত্র'র প্রবেশ। তার মুখে বিরক্তির ভাব, দিবানিদ্রায় আয়োজনে ব্যাঘাত পেলে সকলেরই যেমন হয়। কাপড়টা আর দু-ভাঁজে লুঙ্গির মতো ক'রে পরা, গায়ে গেঞ্জি।

'এই যে এসো, ব'সে যাও, ঐ কোণটায় বোসো। চলুক তাস খানিকক্ষণ। কই অরুণা, বসলি না এসে? ওগো, তুমি আবার কোথায় গেলে?'

হাঁক-ডাক শুনে বাইরের লোক মনে করতে পারতো কী যেন একখানা কাণ্ড হচ্ছে। তারপর, সুমন্ত্রর দিকেই তাকিয়ে বললেন: 'এসো-এসো। ও-কী, ও-রকম অসভ্যের মতো কাপড় পরেছিস কেন?'

বিজয়া বললেন—'পরেছে তো পরেছে। তুমি ওর সবটা নিয়েই ও-রকম করো কেন বলো তো?'

'আহা—একটুখানি বলেছি তো কী হয়েছে। আমাদের চোখে যা ভালো লাগে না, তা নিয়ে আমরা অমন একটু বলবোই! এসো, আরম্ভ করা যাক!'

সুমন্ত্র দেয়ালের দিকে তাকিয়ে বললে, 'আমি খেলবো না।'

'বাঃ!' হৃষীকেশবাবু গর্জন ক'রে উঠলেন। 'যজ্ঞের সমস্ত আয়োজন সম্পূর্ণ হ'লো, এমন সময় তুমি একটি অশ্ব কিনা সব পণ্ড ক'রে দিলে। এসো-এসো—বেশিক্ষণ লাগবে না। তোমার মা ব্রে হ'তে বেশি সময় নেন না, জানোই তো।'

কথার শেষে হো-হো ক'রে তিনি হেসে উঠলেন।

সুমন্ত্র চুপ ক'রে রইলো। সম্পূর্ণ তাসগুলো লম্বা চিকচিকে স্রোতে হাত থেকে বিছানায় ফেলতে-ফেলতে হৃষীকেশবাবু আবার বললেন: 'এসো-এসো। এদিকে দু'টো প্রায় বাজলো। একটু ঘুমুতেও হবে তো রোববারে।'

সুমন্ত্র কথা বলার একটা ছুতো পেলো—'বড়ো ঘুম পেয়েছে।'

সে-কথা শুনতে না-পেয়ে, কি গ্রাহ্য না-ক'রে হৃষীকেশবাবু তাসগুলো কুড়িয়ে নিয়ে বললেন, 'এক গ্লাস জল নিয়ে আয় তো, অরুণা। দেরি করিসনে, আরম্ভ হ'য়ে গেছে।'

সুমন্ত্র এবার নিজে থেকেই বললে, 'আমি খেলবো না।'

হৃষীকেশবাবু এমনভাবে সুমন্ত্রর দিকে তাকালেন যেন কথাটা ঠিক বুঝতে পারছেন না। সুমন্ত্র আবার বললে, 'আমি খেলবো না, তাস খেলতে আমার ভালো লাগে না।'

হঠাৎ হৃষীকেশবাবু অনুনয়ের সুরে বললেন, 'আয় না মন্তু, একটু খেলি।'

সুমন্ত্র বললে, 'বুদ্ধিমান সাবালক মানুষ কী ক'রে তাস খেলে সময় কাটায়. তা আমি ভাবতেও পারি না।'

'দুঃখের বিষয় তুমি বুদ্ধিমানও নও, সাবালকও নও।'

সুমন্ত্র আর-কোনো কথা বলবে না। নিঃশব্দে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলো। তুচ্ছ একটা ব্যাপার নিয়ে কেমন বিশ্রী হ'য়ে গেলো যেন। একটু সময়, সকলেই চুপচাপ। তারপর হৃষীকেশবাবু তাসগুলো এক পাশে সরিয়ে রেখে শুয়ে পড়লেন লম্বা হ'য়ে। 'নে অরুণা, তাসগুলো তুলে রাখ।'

অরুণা জল আনতে গিয়েছিলো, ফিরে এসে ছাখে এই কাণ্ড।

'কী বাবা, হ'লো না খেলা?'—তার স্বরেও নৈরাশ্য।

'নে-নে, বিরক্ত করিসনে এখন একটু ঘুমোতে দে।'

টুনকি ছিলো এই সমস্ত ঘটনার নীরব সাক্ষী, এইবার সে এগিয়ে এসে

বললো 'ঘুমোবে বাবা? তোমার পাকা চুল বেছে দিই?'

'পাকা চুল বললি যে? আমার চুল পেকেছে নাকি?'

'বা, সেদিনও তো তিরিশটা বের করলাম। দশটায় পাঁচ পয়সা দেবে বলেছিলে—'

'উঃ, এত!'

টুনকি হেসে বললে, 'দাওনি বাবা, এর আগেও দাওনি! তোমার কাছে সবসুদ্ধু আমি পঁয়ত্রিশ পয়সা পাবো!'

'বাপ্‌রে, টনটনে হিসেব! ঐ বুঝি ডুগডুগি বাজিয়ে ভালুক-নাচ এলো! যা, ছোট্!'

ছোটো-ছোটো পায়ে ছুটে নেমে গেলো টুনকি।

'অরুণা, শিয়রের ঐ জানলাটা ভেজিয়ে দে তো।'

জানলা ভেজিয়ে অরুণা চ'লে গেলো। তারপর হৃষীকেশবাবু চোখ বুঁজে অনেকক্ষণ চুপ ক'রে রইলেন। খাটের অন্য দিকে বিজয়াও কাৎ হয়েছেন একটু। তাঁর চোখ ঘুমে লেগে আসছে, এমন সময় হৃষীকেশবাবু হঠাৎ বললেন, 'মন্তুটার কী যেন হয়েছে।'

'উঁ'? ধড়মড়িয়ে চোখ মেললেন বিজয়া।

'মন্তুর কথা বলছিলাম।'

'কী?' ঘুমের গলায় বিজয়া বললেন।

'মন্তুটা কেমন হয়েছে, দেখেছো? সারাক্ষণ ঘাড় বেঁকিয়েই আছে। আগে তো এমন ছিলো না কখনো।'

'তুমিই বা ওকে ও-রকম বলো কেন সব সময়? ছেলে বড়ো হয়েছে, সেটা মনে রেখো।'

হৃষীকেশবাবু হেসে উঠলেন—'বড়ো! বড়ো হয়েছে মন্তু!'

'আমি তো ওকে কত সমীহ করে চলি আজকাল।'

'মাথা খাচ্ছো আর কি। পড়াশুনোয় এত ভালো হ'লেও কিন্তু স্বভাবের এই ট্যারচামি না-সারলে তো কিছুই হবে না।'

'একটা কথা বলি, শুনবে?' ভীত, করুণ দৃষ্টিতে বিজয়া স্বামীর মুখে তাকালেন।

'তোমার আবার কী-কথা?'

'তোমার ছেলের কথাই। তুমি ওর উপর কোনোরকম জবরদস্তি করতে যেয়ো না। এ-বয়সটায় ছেলেরা একটু হয়ই ও-রকম।'

'হয়ই, না? এ বয়সের ছেলের খবর আমার চেয়ে বেশি তুমি জানো, না? তিরিশ বছর আগে এ-বয়সের ছেলে কে ছিলো—তুমি? না আমি?'

এই অকাট্য যুক্তিতে বিজয়া তখনকার মতো বোবা হয়ে গেলেন।

'আমরা তো এ-রকম ছিলুম না। কত কষ্ট করেছি ছেলেবেলায়—বাবা-মা'র যাতে সুখ হয়, সেটাই আমাদের লক্ষ্য ছিলো।'

একটু চুপ ক'রে থেকে বিজয়া বললেন, খুব ভীরু স্বরে, 'সব মানুষ এক রকম হয় না তো, সব কালও একরকম হয় না।'

হৃষীকেশবাবু অসহিষ্ণু স্বরে ব'লে উঠলেন, 'আরে এটা কি তোমার একটা কথা হ'লো! যে-ছেলে বাবা-মা'র মুখের দিকে একবার তাকায় না, সে আবার ছেলে কী! এখন তো দেখছি মেয়েই ভালো। অরুণা কি কখনো আমার সঙ্গে ও-রকম করবে! মন্তু বড়ো হয়েছে, মূর্খ হয়নি, ভেবেছিলুম ওকে এবার সবই বলবো—দুঃখটা বুঝতে শিখুক।'

আঁৎকে ব'লে উঠলেন বিজয়া; 'না-না, অমন কাজও তুমি করতে যেয়ো না। ও ছেলেমানুষ, দুঃখ বুঝবে কী ক'রে।'

'তুমিই না একটু আগে বললেও বড়ো হয়েছে। আমাকে মনে রাখতেও বললে সেটা।'

লজিকের ত্রুটিতে কিছুমাত্র লজ্জিত না-হয়ে বিজয়া বললেন, 'আমরা তো ওর থেকে আসিনি, ও-ই এসেছে আমাদের থেকে। আমাদের দুঃখ ও বুঝবে কেমন ক'রে?'

'বুঝবে না?'—হৃষীকেশবাবুর কণ্ঠ এক লাফে পঞ্চমে উঠলো। 'আমি বুঝি না? আমার বয়স যখন আঠারো—'

'থাক-থাক, আমাকে আর কী বোঝাবে? আমি তো সবই জানি। যে-যে-রকম ঘটনার চক্রে পড়ে, তেমনি তো হয়!'

'আজকালকার ছেলেদেরই এ-রকম ভাব দেখছি। স্বার্থপর, নিষ্ঠুর।'

'আহা, এ-ই ছোটো ব্যাপার নিয়ে এত উত্তেজিত হচ্ছো কেন তুমি? কী করেছে মন্তু? তাস খেলেনি, এ-ই তো? না খেলেছে, বেশ করেছে। ভালো না-লাগলে খেলবে কেন? তা তোমার ছেলের নতুন গুণের কথা

জানো তো—ব'লেই বিজয়া থমকে গেলেন।

ভেবেছিলেন কথাটা স্বামীকে বললেন না। সকাল থেকে চেপে ছিলেন। কিন্তু স্বামীকে সকল কথা বলা তাঁর তিবিশ বছরের অভ্যেস, সহজ নয় সেটা কাটিয়ে ওঠা। এমন অনেক কথাই গোপন করবার চেষ্টা করেছেন, তিনি, শেষ পর্যন্ত পারেননি। দু'-ঘণ্টা আগে কি পরে, দু'-দিন পবে কি আগে ব'লে ফেলছেন। এত অতর্কিত মুহূর্তে এ-কথাটাও বেরিয়ে গেলো মুখ নিয়ে।

'কী? কিসের কথা বলছো?'

জোর ক'বে মুখে হাসি টেনে এনে বিজয়া বললেন, 'আগে বলো, রাগ কববে না? ওকে বলবে না কিচ্ছু?'

'দোষ হ'লে বলবো না, এমন অন্যায় অনুরোধ তুমি করবে না।'

'দোষ মনে করলেই দোষ। ছেলেদের সব দেখি তো—ও'রকম দোষ আজকালকার কোন ছেলেরই বা নেই?'

'কী হয়েছে তা-ই বলো না! কী করেছে মন্তু?

ব্যাপারটাকে লঘু প্রমাণ করার চেষ্টায় খুব বেশি ক'রে হেসে বিজয়া বললেন, 'মন্তু সিগারেট খায়।'

'সিগারেট খায়'! সোজা হ'য়ে উঠে বসলেন হৃষীকেশবাবু, ব'সে রইলেন বজ্রাহতের মতো। কিছুই বললেন না খানিকক্ষণ, বলতে পারলেন না। হঠাৎ ফুটে উঠলো তাঁর চোখের সামনে মন্তুর ষোলো বছরের চেহারা। সে এমন বেশিদিনের কথা নয়। সুন্দর-সুগোল মুখে সরল উজ্জ্বল চোখের দৃষ্টি। পাৎলা লালচে ঠোঁট দু'টিতে খুশির আভা লেগে আছে। সেই ঠোঁট আজ সিগারেট চেপে ধ'রে ধোঁয়া উগরোচ্ছে। তারপর সে ছবি মিলিয়ে গেলো, এলো আট বছরের মন্তু, ঢোলা ইজের পরা, ছোট্ট শার্টের খোলা গলায় ধবধবে একটুখানি বুকের আভাস পাওয়া যাচ্ছে। মস্ত মাথায় ঝাঁকড়া চুল, ছোট্ট ঠোঁট দু'টি কাঁপছে হাজার অবান্তর প্রশ্নে। সেই ঠোঁটে আজ সিগারেট।

সেই ঘোরতর গম্ভীর মুখের দিকে তাকিয়ে পরম মিনতির সুরে বিজয়া বললেন, 'পায়ে পড়ি তোমার, ওকে কিচ্ছু বোলো না।'

'না, বলবো না' হৃষীকেশবাবু দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। 'ছেলে উচ্ছন্নে যাক,

লম্পট-মদ্যপ-ব্যাভিচারী হোক, আর আমি কিচ্ছু বলবো না।'

ব্যতিব্যস্ত হ'য়ে উঠে বসলেন বিজয়া স্বামীর পায়ের কাছে।

'ছি-ছি-ছি, কী যে বলো! একটুও আটকালো না তোমার মুখে ও-কথাগুলো উচ্চারণ করতে!'

'আজ সিগারেট, কাল মদ, পরশু···এমনি ক'রেই তো অধঃপাতের পথে নামে মানুষ।'

বিজয়ার নিজের মনেও খটকা লেগেছিলো, কিন্তু স্বামীর এই বাড়াবাড়িতে নিজের কোনো কথা তিনি ব'লে উঠতেই পারলেন না। বরং ছেলের পক্ষ টেনেই বললেন, 'আহা—সবটাতেই তোমার সাপ-ঝলকি ভাব। সিগারেট খেলে কী হয়? কে-না খায় আজকাল সিগারেট শুনি!'

'এইটুকু বয়সে!' গর্জে উঠলেন হৃষীকেশবাবু। 'ও কি কিছু বোঝে! এখন কি ওর নিজের বুদ্ধিতে কিছু করবার সময় হয়েছে? স্বাস্থ্য নষ্ট, অর্থ নষ্ট—এখন বুঝতে পারছি, কেন ওর এত টাকা লাগে? নেশা করলে কি আর টাকা চোখে দেখা যায়! তারপর হঠাৎ গলা নীচু ক'রে বললেন—'তুমি—দেখেছো?'

'আজ সকালে ওর বিছানা তুলতে গিয়ে দেখি, বালিশের নীচে সিগারেটের প্যাকেট।'

'তুমি কী করলে?'

'কী আর করবো—রেখে দিলাম সেখানেই।'

'ওকে কিছু বলোনি তুমি?'

'একবার ভেবেছিলাম বলি। তারপর বড়ো লজ্জা করলো।'

'লজ্জা করলো! ছেলেকে শাসন করতে লজ্জা করলো তোমার!'

এই তিরস্কারের কোনো জবাব না-দিয়ে বিজয়া খুব আস্তে বললেন, 'আচ্ছা, মন্তুকে এখানে পড়ালেও তো হ'তো। এখানকার ইউনিভারসিটি মন্দ কী—অশোক তো পড়ছে।'

হৃষীকেশবাবু স্ত্রী'র মুখের দিকে একটুক্ষণ তাকিয়ে রইলেন, যেন কথাটা শুনতে পাননি, কি বুঝতে পারেননি। তারপর বললেন 'এখন আর সে-কথা ব'লে লাভ আছে কোনো? আমি তো তখনই বলেছিলাম—কাজ নেই কলকাতায় গিয়ে। না, ছেলে বেঁকে বসলেন, কলকাতায় পাঠাতেই হবে

তাকে। এখানে কি কোনো কম্পিটিশন আছে! এখানে আই-সি-এস-এর কোনো স্কোপ নেই—কত ভালো-ভালো কথা শুনলাম তখন। তুমিও ছেলের হ'য়ে ওকালতি করলে—আহা—ওর মন ভেঙে দিয়ে লাভ কী। জবরদস্তি করলে পড়াশুনোতেই মন বসবে না। তা বসবে কেন, এখানে থাকলে আমরা দেখতে-শুনতে পাবো তো! অমন মহাস্বাধীন হওয়া তো চলবে না। বাবু এখন কলকাতায় ধোঁয়া ওড়াচ্ছেন, আর ফাইন আর্টস-এর চর্চা করেছেন! এখানে থাকলে খরচও কম হ'তো, তা বাবুর পোষাবে কেন? এই এতগুলো টাকা নেয় মাসে-মাসে, কী করে জানতে পারি? স্কলারশিপ আছে তার উপর। তবু নাকি বাবুর কুলোয় না, নালিশ লেগেই আছে। তুমিই তো নষ্ট করেছো ছেলেবেলা থেকে আহ্লাদ দিয়ে-দিয়ে।'

বিজয়া প্রতীক্ষমান মুখে তাকিয়ে রইলেন। রাগের ঝড়টা যদি সুমন্ত্রকে ছেড়ে তাঁর উপর দিয়ে ব'য়ে যায়, তাহ'লে তিনি বাঁচেন।

'টাকা নষ্ট করেছে, নিজে নষ্ট হচ্ছে। কোত্থেকে আসে টাকাগুলো তা একবার ভাবে ও? একবাব ভাবে সে কথা?'

'সে-কথা ভাববার বয়স তো নয় ওর।'

'না, বয়স নয়!' স্বামীর চীৎকারে অ-প্রস্তুত বিজয়ার বুকের ভিতরটা ধ্বক্ ক'রে কেঁপে উঠলো। 'আমার কাছে ও-সব দরদ করতে এসো না, আঠারো বছর বয়সে একটা সংসার পড়েছিলো এই মাথার উপর।' হৃষীকেশবাবুর ডান হাত নাটকীয় ভঙ্গিতে উত্তোলিত হ'লো তাঁর মাথার উপর, তারপর দুম্ ক'রে তাকিয়ার বুকের মধ্যে অনেকখানি গর্ত ক'রে দিলে।

'আঃ, কী করো! আস্তে কথা বলতে পারো না!'

'কেন, আস্তে বলবো কেন? ভয় করি নাকি কাউকে?'

কিন্তু এ কথাটাও হৃষীকেশবাবু বেশ গলা নামিয়েই বললেন।

'নাও, আর মাথা-গরম করো না, একটু ঘুমিয়ে নাও।'

হৃষীকেশবাবু শুয়ে পড়লেন বালিশে মাথা রেখে, চুপ ক'রে রইলেন খানিকক্ষণ। তারপর স্ত্রীর দিকে না তাকিয়ে তার পক্ষে অস্বাভাবিক আস্তে বললেন, 'প্র্যাকটিসের অবস্থা দিন-দিন খারাপ হচ্ছে।'

বিজয়া চুপ। হৃষীকেশবাবু বললেন, 'কয়েক ঘর বাঁধা মক্কেল আছে ব'লে টিঁকে আছি। কিন্তু এমনিতে যা অবস্থা। জীবন সরকারের অত বড়ো

প্র্যাকটিশ ছিলো—ফেলে-ছড়িয়ে মাসে দেড় হাজার দু-হাজার হ'তো, এখন টেনে-টুনে আটশোও হয় না সব মাসে।'

'জীবন সরকার তো শুনি একটা মাতাল।'

'ঐ মদ্যপান ব্যাপারটা আইনের ব্যবসায় বেশ চলতি। পাট অব দি গ্রেট ট্র্যাডিশন, বলতে পারো। এক তোমার এই অযোগ্য স্বামীই ও-রসে বঞ্চিত রইলো।' হৃষীকেশবাবু হেসে উঠলেন।

একটু পরে আবার বললেন, 'থাকগে, আমি কিছু ভাবি না শরীরে যতদিন রক্ত আছে, আর সে-রক্তে জোর আছে, ততদিন ভাবনা কী। স্বাস্থ্যটা পেয়েছিলাম—'

'আর বোকো না তো, এখন ঘুমোও '

স্ত্রীর মুখটা ভালো ক'রে দেখবার জন্য হৃষীকেশবাবু পাশ ফিরলেন।

'ভাবনা কী; কিচ্ছু ভাবনা নেই। কেবল অরুণার বিয়েটা—'

'আহা—একসঙ্গে ভাবনা উথলে উঠলো কেন তোমার? হবে, সবই হবে। কোনো-কিছু তো ঠেকে থাকে না কোনদিন।'

'সেই যে পাত্রটির খোঁজ পাওয়া গেছে, সেটা না ফস্‌কায়।'

'কে—কোনজন? বিজয়ার স্বরে স্পষ্ট উৎসাহের আভাস।

'আহা—তুমিও যেন দিল্লি থেকে এলে। সেই যে গাভার ঘোষ, এম-এ ছেলে, টাটানগরে চাকরি করে—'

'ও হ্যাঁ, আমিও এটার কথাই ভাবছিলাম। তা এটা যদি হ'য়ে যায় তো ভালোই। আর-কোনো খবর পেলে নাকি ওদের?'

'ছেলে স্বয়ং নাকি শীগগিরই আসছে ছুটি নিয়ে মেয়ে দেখতে'—

'তা-তো শুনছি। দেখা হয়নি তোমার সঙ্গে মুরারী বাবুর?'

'তাঁর এজলাসে দেখা হয়, সেটা তো আর কথা বলবার জায়গা নয়। শীগগিরই এখান থেকে তাঁর বদলির কথা। তারও ইচ্ছে তার আগেই—'

'বেশ তো, বেশ তো। তা তিনি একবার এসে অরুণাকে—'

'তিনি দেখবেন না' ঠোঁট বেঁকিয়ে হৃষীকেশবাবু বললেন 'ছেলের পছন্দ হলেই হ'লো। জর্জ মানুষ—একটু মেজাজও আছে।'

বিজয়া গম্ভীর গলায় মন্তব্য করলেন 'হুঁ'। তা দাবি-দাওয়ার কথা কিছু হয়েছে নাকি?'

'সে-রকম কিছু হয়নি এখনো—তবে কিছু তো লাগবেই। সেই কথাই ভাবছি।'

'আচ্ছা—আচ্ছা' বিজয়া হাসি মুখে বললেন, 'আগে সব ঠিক হোক তো, তারপর টাকার ব্যবস্থা হবেই একরকম।'

'আকাশ থেকে তো আর পড়বে না। রোজগার তো কম করিনি জীবনে, একটা পয়সাও হাতে নেই। টাকা যা আসে, সঙ্গে-সঙ্গেই তা তলিয়ে যায়।'

'তা নিয়ে আপশোস ক'রে তো লাভ এখন। টাকা জমানো হচ্ছে এক-একজনের স্বভাব, যে পারে সে দশ টাকাতেও পারে, যে পারে না সে হাজার টাকাতে পারে না।'

'একটা ইনসিওরেন্সের টাকা সামনের বছর পাওনা হবে, তা থেকেই ধার করতে হবে দেখছি।'

'না-না, ইনসিওরেন্সের টাকা নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করো না, ঐটাই তো তোমার শেষ সম্বল।'

কথাটা হঠাৎ হৃষীকেশবাবুর মনে লাগলো। তাই তো কেবল ছেলেমেয়েদের কথাই তিনি ভাবেন, স্ত্রীর কথা কখনো নয়। স্ত্রীর কথা আলাদা ক'রে ভাববার দরকার করে না, কিন্তু···ধরা যাক আজ যদি তিনি হঠাৎ মারা যান? কোথায় দাঁড়াবে বিজয়া? একটা বাড়ি পর্যন্ত নেই যে মাথা গুঁজবে। ছেলে? ছেলে বড়ো হোক, কৃতী হোক, এটা সব মা-বাবাই চায়, কিন্তু ছেলেকে নিয়ে মুনাফার আশা কে করে? তা ছাড়া, ছেলেকে দিয়ে বিশ্বাস নেই। স্বামী না-থাকতে হিন্দু স্ত্রীলোকের কোনো ভরসাই নেই এ-জগতে। ছেলে যদি করে, ভালো; কিন্তু না যদি করে? হৃষীকেশবাবুর মনে রীতিমতো কষ্ট হ'লো সন্তানকে মা থেকে এ-রকম বিচ্ছিন্ন ক'রে ভাবতে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তা না-ভেবেই বা উপায় কী। শেষ পর্যন্ত, দুই জীবনের দু'টো আলাদা স্রোত, দু'টো আলাদা স্বার্থ। স্বামী-স্ত্রী ছাড়া কোনো দু'জন মানুষেরই সম্পূর্ণ এক স্বার্থ নয় জগতে। স্বামী যার জন্য রেখে না যায়, আশে-পাশে তার যতই থাক, কেউ নিঃস্ব নয় তার মতো। ছেলেমেয়ের সুখের জন্য অবাধে অজস্র খরচ করবার সময় স্ত্রীর কথাটাও বোধহয় একবার ভাবা দরকার। ছেলে দাঁড়াবে নিজের পায়ে, মেয়ের বিয়ে

হবে, স্ত্রীর আর-কেউ থাকবে না, আর-কিছু থাকবে না। কথাটা এমন স্পষ্ট, এমন নির্মমভাবে হৃষীকেশবাবু আগে কখনো ভাবেননি। মনটা ভারী হ'য়ে উঠলো তাঁর।

'ইনসিওরেন্সের টাকাটা তাহ'লে থাক—সত্যি তা-ই ভালো। মেয়ের বিয়ে যদি হবার হয় তো এমনিই হবে।'

'দরকার হ'লে আনবে বইকি,' খুব সহজ সুরে বিজয়া বললেন। 'কিন্তু দরকার হবে না, দেখো।'

হঠাৎ একটি বাচ্চা-ঝড়ের মতো পিণ্টু ঢুকলো ঘরে। পরনে শার্টের উপর খাকি হাফ-প্যাণ্ট, মুখ টকটকে লাল রোদে ঘুরে-ঘুরে। দম নেবার সময় না-নিয়ে বললে, 'মা, দু'টো টাকা দাও তো শীগগির।'

'পয়সা! পয়সা দিয়ে কী করবি?'

'দাও শীগগির, দেরী করো না।'

'কোন রাজ্যে ঘুরে এলি রে দুষ্টু? এখন আবার কোথায় যাবি—'

'সিনেমায় যাবো—লরেল-হার্ডি। শীগগির—তিনটে বাজতে বেশি দেরী নেই?'

বিজয়া শক্ত হ'য়ে গিয়ে বললেন, 'রোজ-রোজ সিনেমা দেখার জন্য পয়সা দিতে পারি না। যা, ভাগ।'

'ইস্, রোজ বুঝি? সেই তো গেলো শনিবার গিয়েছিলাম—'

'আবার একমাস পরে যাবি। যা—কিছুতেই পয়সা পাবি না।'

মা-র আঁচল ধ'রে টেনে পিণ্টু বললে: 'দাও না, মা—আচ্ছা, দু'টাকা না-ই দিলে, এক টাকা দাও। কোথায় তোমার চাবি? দাও, আমি খুলে নিচ্ছি।'

এক ঝটকায় আঁচলটা সরিয়ে নিয়ে বিজয়া বললেন: 'পালা শিগগির, বলছি। পাবি না আজ পয়সা, কিছুতেই না।'

পিণ্টুর মুখ প্রায় কাঁদো-কাঁদো হ'য়ে গেলো। অন্য দিকে তাকিয়ে বিজয়া বলতে লাগলেন: 'এ-ছেলেটাই কি কম পয়সা ওড়ায় নাকি। খালি সিনেমা আর সিনেমা—কী যে নেশায় পেয়েছে—'

'আহা, দিয়ে দাও না ওকে দু'টাকা,' ঘুমে প্রায় জড়িয়ে-আসা চোখ মেলে হঠাৎ হৃষীকেশবাবু ব'লে উঠলেন।

বিজয়া খাট থেকে নেমে হাত-বাক্স খুলতে-খুলতে বললেন, 'কে কাকে আদর দিয়ে-দিয়ে নষ্ট করে, সেটা মনে রেখো।'

পিণ্টু পয়সা নিয়ে লাফাতে-লাফাতে চ'লে গেলো।

* * *

দি পাইন্স, শিলং

প্রীতিভাজনেষু, ৭ মে

আপনি চিঠি লিখতে বলেছিলেন। দেখছেন তো, সে-কথা ভুলিনি। তবে এখানে এসেই যে লিখিনি, তার অনেক কারণের মধ্যে এটাই প্রধান যে আমার মনে ক্ষুদ্র একটি আশা বাসা বেঁধেছিলো যে, আপনিই হয়তো আগে লিখবেন। সে-আশার বাসা সম্প্রতি ভেঙেছে। (পারিবারিক বৃক্ষের আশ্রয়ে বন্ধুদের কি এমনি ক'রে ভুলতে হয়?) এখন এই শূন্য বাসায় আর-একটি আশার শাবক উঁকিঝুঁকি দিচ্ছে। এ-চিঠির উত্তর হয়তো ঠিক সময়ে পাবো। হোপ-স্প্রিংস-ইটার্নেল ইত্যাদি।

জানেন, সেদিন শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত আমার আশা ছিলো (আবার আশা! প্রমথ চৌধুরী হ'লে বলতেন এত আশাআশি দেখে হাসাহাসি ছাড়া উপায় থাকে না)—আশা ছিলো যে আপনি হয়তো আসবেন। দেখতে পাচ্ছিলুম আপনাকে, কুলির মাথায় মোট চাপিয়ে দ্রুত পায়ে বিশ্বস্ত দৃষ্টিতে প্ল্যাটফরম দিয়ে আসছেন, এদিকে ঘণ্টা বুঝি বাজে। ঘণ্টা বাজলো, গাড়ি ছেড়ে দিলো, আমি জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়েই রইলুম, দমদম যখন এসে গেলো তখন খেয়াল হ'লো। বুঝতে পারলুম আপনি আর এলেন না, অগত্যা মার্ক টোয়েনের বই খুলে শুরু ক'রে দিলুম পড়তে। বড়ো মজার বই 'ইনোসেণ্টস অ্যাব্রড'—পড়েছেন?

আচ্ছা, শিলং-যাত্রা না-হয় না-ই করেছিলেন, সী-অফ্ করতে তো আসতে পারতেন স্টেশনে? ভাবখানা এই, যেন কতদিনের জন্য কত দূর দেশেই যাচ্ছি। তা দূর মন্দই বা কী; আর দেখা তো হবে আবার সেই কলেজ খুললে, কত দেরি আর। আপনি এলে আমি একাই খুশি হতাম না। বাবা খুশি হতেন, মা খুশি হতেন, টপসি খুশি হ'তো। টপসির কথা শুনে পাছে আপনার মানহানি হয়, সেইজন্যে বলে রাখছি যে টপসি যাকে-তাকে পছন্দ করে না; ওর ক্রিটিকাল ফ্যাকালটি আমাদের ইংরিজির প্রোফেসর

ডক্টর ডাট-এর চেয়েও বেশি ; ওর নজরে পড়া, আমি বলবো, রীতিমতো বিরল সৌভাগ্য।

তারপর—আপনি কেমন আছেন ? ঢাকা জনপদটি কেমন ? দেখবার সৌভাগ্য হয়নি কখনো। এই লম্বা দিনগুলো কী ক'রে কাটান ? ডেসপারেট হ'য়ে ডক্টর ডাট-এর অনুমোদিত বইগুলোই পড়তে শুরু ক'রে দেননি, আশা করি ? আমি তো ভেবে পাই না মানুষ কখন এত পড়ে, আর পড়েই বা কা সুখ পায় ? সুখটা কি পড়বার। না, এত-এত বই পড়েছি সে কথা ভাবতে পারার—না লোককে জানতে পারার ?

আমার কথা যদি জানতে চান, এখানে এসে আমার ভালো লাগছে। আমি আর টপসি খুব ঘুরে বেড়াচ্ছি। আমি যদি রবীন্দ্রনাথ হতুম, তা'হলে অনেকগুলো পাতা প্রকৃতি বর্ণনায় ভরিয়ে দিতে পারতুম। কিন্তু আমি এখানে বেশ আছি এবং আপনি কেমন আছেন তা জানতে খুব উৎসুক, এ ছাড়া আর বিশেষ-কিছু বলবার মতো মনে পড়ছে না, যেহেতু আমি নিতান্তই আপনার অযোগ্য সহপাঠিনী—

'মায়া'

* * *

—লারমিনি স্ট্রীট
পোঃ ওয়াড়ি, ঢাকা
১০ মে, রাত্রি

"সুচরিতাসু,

এই গরমে বৃষ্টির ছোটো পশলার মতো, আপনার চিঠি। পশলাটি বড়োই ছোটো, এই যা আপশোস। লিখতে-লিখতে হঠাৎ অন্য কিছু মনে পড়ে গিয়ে উঠে গেলেন বুঝি ? আমি এখানে এসে যা সুখে আছি, বলবার নয়। সকালে উঠে তা-না-না-না, তারপর খাওয়া, ঘুম ; বিকেলে আর-এক প্রস্থ তা-না-না-না ; রাত্রে খাওয়া, ঘুম। এ-হারে এগোতে থাকলে গোলগাল রসগোল্লার মতো চেহারা নিয়ে কলকাতায় ফিরতে পারবো, এই আশা আছে মনে। বই কতগুলো এনেছিলাম—আজকালকার পকেট-জ্ঞানসমুদ্র গোছের গোটাকয়েক ভল্যুম—সেগুলো বাক্স থেকেও বের করা হয়নি। জীবনের নানা রহস্যের, মানব সভ্যতার নানা বৈচিত্র্যের মর্মোদ-ঘাটন করতে সম্প্রতি আমি আদৌ প্রলুব্ধ হচ্ছি না ; "নীলাবসনা সুন্দরী"

কি "দেবদাস"-"পরিণীতা" গোছের বই হাতের কাছে পেলে পড়া যেতো বরং। অবস্থার সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে চলা নাকি একটি মহৎ গুণ। অন্তত, অবস্থার স্রোতে গা ঢেলে দেয়াটা যে সুখের, সেটা ঠিক। সম্প্রতি সেই সুখে আকণ্ঠ ডুবে আছি।

সেদিন আপনাকে সী অফ্ করতে যাইনি—ইচ্ছে ক'রেই। বুকের মধ্যে ঈর্ষার সবুজ সাপকে আরো খাদ্য দিয়ে মোটা ক'রে তুলে লাভ নেই। অ মার সম্বন্ধে আপনি নিজস্ব ও পারিবারিক যে শুভেচ্ছা প্রকাশ করেছেন, তার জন্য আমি সত্যি কৃতজ্ঞ। নিজের উপর শ্রদ্ধা হচ্ছে রীতিমতো। এখানে এসে ক্রমশই সংগ্রহ করছি যে আমাকে দিয়ে এ জগতে কখনাই কিছু হবে না। এখন শুনলাম এবারের ছুটিতে আমি শিলং পাহাড়ে গেলে তিনটি মানুষ ও একটি কুকুর খুশী হ'তো। এবং তিনটি মানুষ ও একটি কুকুরকে একযোগে খুশী করতে পারা এ জগতে কম কৃতিত্ব নয়।

'সকলকে দিয়ে সব হয় না'—কথাটা অতি পুরোনো ও অতি সত্য। এমন মানুষও হয় যাকে দিয়ে কিছুই হবার নয়! যথা, আমি। আমি আই-সি-এস, হ'য়ে বাংলা উপন্যাস লিখবো না, পলিটিক্যাল মঞ্চ থেকে দেশবাসীকে 'বাণী' শোনাবো না, প্রতি সপ্তাহের আনকোরা বিলিতি বুলি চটকে মূর্তিমান কালচার হ'য়ে উঠবো না, এমন কি, বাবরি চুল আর ফর্সা বঙের জোরে সিনেমার অভিনেতা হ'য়ে এক পয়সার সাপ্তাহিকে ছবি ছাপিয়ে যে জীবন ধন্য করবো, এমন আশাও নেই। ঘুরবো আড্ডা থেকে আড্ডায়, খ্যাতনামাদের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় রাখার চেষ্টা করবো, খ্যাতনামাদের ভালো-ভালো কথা নিজের ব'লে চালাবো অন্য জায়গায়, কেউ বোকা বলবে না, সবাই ভালোমানুষ ব'লে জানবে, কেউ বিশেষ আমলে আনবে না। ভেবে দেখতে গেলে, এ-রকম জীবন মন্দ নয় নেহাৎ। আপনি কি বলেন?

অবশ্য আপনার কথা আলাদা সব দিক থেকেই আলাদা। আমাকে আপনার বন্ধুতা দান ক'রে আপনি আমার প্রতি দয়াই প্রকাশ করেছেন। আপনার বাড়িতে যাঁদের আনাগোনা, তাঁদের সঙ্গে নিজেকে একবার তুলনা করলেই সেটা বুঝতে পারি। কৃতী হবার জন্যই তাঁদের জন্ম। আমি যদি বেঙ্কটরমণের মতো টেনিস খেলতে পারতুম, তাহ'লেও আপনার এ-করুণা সার্থক হ'তো। আমি অবশ্য নিজেকে এই বলে প্রবোধ দিই যে কোনো-

কোনো অবস্থায় টেনিস খেলোয়াড় হবার চাইতে দর্শক হওয়াই ভালো। কেন না যখন টেনিস খেলেন, তখন কী সুন্দর যে আপনাকে দেখায়, সেটা খেলোয়াড়ী চোখে নিশ্চয় ধরা পড়ে না। তারা খেলা দেখে, আমি আপনাকে দেখি।

আর লিখতে পারছি না। পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর ও অর্থ প্রার্থনা ক'রে পিতৃদেবকে চিঠি ছাড়া জীবনে কিছু লিখেছি ব'লে মনে পড়ে না। এক দৌড়ে এতটা লিখে হাঁপিয়ে পড়েছি। তা-ছাড়া ঘুমও পেয়েছে। 'সুমন্ত্র'

* * *

দি পাইন্স, শিলং

বিনয়াবতারেষু, ১৫ই মে

ইচ্ছে করলেই আপনার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বিনয় করতে পারতুম, কিন্তু আজ কী হয়েছে, তা আগে শুনুন। কয়েকদিন যাবৎই একটা বেড়াল ঘুরঘুর করছে আমাদের বাড়িতে—কী বলবো, ঠিক পেত্নার মতো দেখতে। এমনিতেই আমি দু'চক্ষে বেড়াল দেখতে পারি না; তার উপর একেবারে ঠিক যদি পেত্নীর মতো দেখতে হয়, কেমন লাগে বলুন তো? আমি ভুবনকে বলি মারো, বীর বাহাদুরকে বলি কাটো, আলতাফকে বলি পাকড়ো, তা ঐ উৎপাত দূর হয় না কিছুতেই। আজ হয়েছে কী আমরা খেতে বসবো দেখি, কখন থেকে শ্রীমতী গুটিশুটি হ'য়ে ব'সে আছেন টেবিলের তলায়। রাগে শরীরটা জ্ব'লে গেলো। ডাক্‌লুম, টপসি! টপসি ছুটে এলো তাড়া ক'রে কিন্তু কাছে এসেই থমকে দাঁড়িয়ে শুরু করলো চীৎকার। ভাবতে পারেন, বেড়ালটার এতটুকু গ্রাহ্য নেই, পিঠ ফুলিয়ে চুপচাপ ব'সে চোখ মিট্‌মিট্‌ করতে লাগলো। আমি বললুম, 'টপসি, তুই একটা আস্ত কাওয়ার্ড। অত বড়ো শরীরটা নিয়ে অতটুকু বেড়ালের কাছে যেতে পারিসনে? ধিক্‌ তোকে।' এই না ব'লে দিলুম ওকে ঠেলে দে টেবিলের তলায়। তারপর একটা ফোঁ-ও-শ্‌ শ্‌ শ্‌, সঙ্গে-সঙ্গে টপসির তীব্র চীৎকার ও তারপর বেড়ালরূপী পেত্নীর দে ছুট। আমি বললুম, 'কেমন, আর আসবি!'—ব'লে টপসিকে একটু আদর করতে গিয়ে দেখি—ও' মা! রক্ত এলো কোত্থেকে? টপসি মাথা নীচু করে চুপচাপ দাঁড়িয়ে, আর তার কান বেয়ে রক্ত পড়ছে ফোঁটা-ফোঁটা! দস্যি-ডাইনী-রাক্ষুসী বেড়াল। যাদের নখ চামড়ার ভিতরে

ঢাকা, কক্ষনো যেন তাদের কেউ বিশ্বাস না করে।

তারপর খেয়ে-দেয়ে বাবার মোটা লাঠিটা নিয়ে সারা বাড়ি ঘুরে এলুম কোথাও দেখা পেলুম না রাক্ষুসীটার। তারপর এই তো আপনাকে চিঠি লিখতে বসেছি—মোটা লাঠিটা হাতের কাছেই আছে। আবার আসুক না আস্ত রাখবো ওকে। টপসি এখন ভালোই আছে—আমার পায়ের কাছে শুয়ে ঘুমুচ্ছে। বেচারা ঐ পুঁচকে বেড়াল কিনা একটা খাস্ টেরিয়রকে দিব্যি মেরে গেলো। তা কুকুর ও-রকম মারতে পারবেই বা কেন, কুকুর তো এত ছোটলোক নয়।

সম্প্রতি রাস্তায় একটি ছোটো মেয়ের সঙ্গে আমার ভাব হচ্ছে, তার নাম ন্যান্সি। আয়া তাকে ঠেলে নিয়ে যায় পেরাম্বুলেটরে, আর সে বসে থাকে আপেলের মতো টুকটুকে গাল আর নীলচে জোলো-জোলো চোখ নিয়ে বোধিসত্ত্বের মতো গম্ভীর মুখ করে। তাকে যদি জিগ্যেস করি, তোমার নাম কী? সে বলে, নান্থি। যদি বলি, তোমার বাড়ি কতদূর? সে বলে, নান্থি। প্রায় হ-য-ব র-ল-র তাকাইয়ের মতো। ভারি মজা·····

১৬ মে,

কাল আর একবার বেড়ালটার খোঁজ করতে উঠে গিয়ে ছিলুম, চিঠি শেষ করা হয়নি। রাক্ষুসীটা আজ আবার এসেছিলো, উঁকিঝুঁকি দিচ্ছিলো রান্নাঘরের কাছে, বীর বাহাদুর আর আলতাফ দু'জনে মিলে খুব মেরেছে ওকে। খুব মানে অবিশ্যি কিছুই নয় দু'-এক ঘা পড়তে না পড়তেই চার পা তুলে চম্পট! অসভ্য-জানোয়ার, কাল কুকুরটার রক্ত বের ক'রে দিলি, আজ না-হয় একটু মারই খা।

আপনার চিঠি দু'বার-তিনবার পড়েছি। ঐটুকু লিখেই ঘুম পেয়ে গেলো? নিজের অকর্মণ্যতার হাতে-হাতে প্রমাণ দিলেন বুঝি। নিজেকে এ-রকম ওয়ার্থলেস বলে ভাবতে মন্দ লাগে না—দিব্যি রোমান্টিক। আমিও মাঝে-মাঝে ও'রকম করে ভাবি। কিন্তু বেশীক্ষণ চালাতে পারি না, নিজেরই হাসি পেয়ে যায়। কিছু করতেই হবে নাকি? কিছু হ'তেই হবে নাকি? আমি আছি তো আছি। আপনি আছেন তো আছেন। আবার কী? এই যে টপসি এত চ্যাঁচাচ্ছে, এত লাফাচ্ছে আর এত খেলছে, এত শুঁকছে, এত ঝুঁকছে—ও কী করছে? কিছুই করছে না, কিন্তু আবার সবই করছে।

ওকে তো করতে হয় না কিছুই। ও যে আছে, এটাই খুব চমৎকার।

কিছুদিন আগে পর্যন্তও আমার শখ ছিলো এরোপ্লেন চালাতে শিখবো। সে-শখ যে এখন আর নেই। তাতেই প্রমাণ হয় যে, ইচ্ছেটা খাঁটি নয়। এখন দেখছি ও'সব বৃহৎ কাণ্ডকারখানায় কিছুই দরকার পড়ে না—জীবনটা এমনিতেই বেশ।

এখানে ভারী ভালো পাইনের হওয়া। আমার আগে অনেকেই বোধ করি এ-মন্তব্যটা ক'রে গেছেন। কিন্তু যে হেতু অভিজ্ঞতাটা আমার পক্ষে নতুন, মন্তব্যটাও নতুন মনে হচ্ছে। এ-অঞ্চলে মোটরের রাস্তাগুলো চমৎকার —কিন্তু সে-কথাও 'শেষের কবিতা'য় প'ড়ে থাকবেন। হায়রে, লেখকদের যদি উপায় থাকতো!

'মায়া'

পুনঃ—মার্ক টোয়েনের বইখানা আমার এত বেশি ভালো লেগেছে, যে আপনাকে না পাঠিয়ে পারলুম না! দিবানিদ্রার ভার কিঞ্চিৎ লাঘব হোক। বইখানা কিছুতেই খুঁজে পেলাম না। পরে পাঠাচ্ছি। চিঠি লিখবেন।

* * *

শিলং,

'বন্ধুবরেষু, ১৭ই মে

আজ হঠাৎ বৃষ্টি এলো। বেশ একটু ঠাণ্ডা নেমেছে। ব'সে আছি শার্সি আঁটা জানলায় শালমুড়ি দিয়ে। আকাশটা মন-মরা বাতাসে শীত, গাছপালা ঘোলাটে। ভালো লাগছে না। কী-করি, কী করি গোছের একটা খুঁতখুঁতানি মনটাকে কামড়ে ধরেছে। এ অঞ্চলের বৃষ্টিপাত সম্বন্ধে অনেক শুনেছি। ভয়ে মরছি, এমনি চলবে না তো দিনের পর দিন? কোন সুখের আশায় যে মানুষ এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় আসে—যখন দেখা যাচ্ছে, প্রকৃতির কারখানায় অদৃশ্য কারসাজির উপরেই নির্ভর করে আমাদের সমস্ত সুখ। কী একটু ডিপ্রেশন্ হ'লো বে অব বেঙ্গলে ঈশ্বরই জানেন, তার ফলে বৃষ্টি এলো ঝম্‌ঝম্, আমাদের সব উৎসাহের উপর পড়লো মেঘের ভিজে কম্বল চাপা।

আজ কিছু করবার নেই, কিছু ভাববার নেই। টপসি সকাল থেকে

অঘোরে ঘুমুচ্ছে ওর কম্বলখানার উপর গোল হ'য়ে। মানুষের উপর এইখানে ওর মস্ত জিৎ। যখনই দেখলো বেড়াবার-খেলবার সুবিধে হবে না, দিলে লম্বা ঘুম মনের শান্তিতে। মেনে নিলে দুরাবস্থাটা অনায়াসে। আমরা ওরকম ক'রে ঘুমোতে পারি না। কিছু ভালো না-লাগলেও, কিছু করবার না-থাকলেও, জেগে থাকি, হাঁটা-চলা করি, মন খারাপ করি। এখন শুধু মনে হচ্ছে যদি আর-কেউ থাকতো, এই জানালার ধারে মুখোমুখি চেয়ার টেনে ব'সে গল্প করতে পারতুম, আস্তে-আস্তে, থেমে-থেমে, মাঝখানে সাদা পেয়ালার মুখে উঠতো সাদা ধোঁয়া, তারপর হয়তো বৃষ্টি থামতো, ঝিকমিকিয়ে উঠতো রোদ, অনেকক্ষণ গল্প ক'রে হঠাৎ চুপ ক'রে যাওয়াটাও যেন তেমনি।

আশাটা বিশেষ কিছু নয়, এর চেয়ে অনেক বড়ো-বড়ো আশা মানুষ করেছে—এবং পূর্ণ করেছে, শুনেছি। কিন্তু সম্প্রতি আমার এই অতি ক্ষুদ্র আশা পূর্ণ হবার কোনো লক্ষণই দেখা যাচ্ছে না। এবং এ-চিঠি যদি আরো লিখতে থাকি, তাহ'লে এই মন-খারাপের হাওয়া থেকে এমন সব কথা সম্ভবত লিখতে থাকবো, যা নিয়ে দেখা হ'লে আপনি নিশ্চয়ই অনেক ঠাট্টা করবেন আমাকে। অতএব হে বন্ধু, বিদায়। আপনি কেমন আছেন?

মার্ক টোয়েনের বইটা পাওয়া গেছে, কিন্তু কোথায় কাঁচি, কোথায় সুতো, কোথায় ব্রাউনপেপার—এই বাদলার দিনে সহজ নাকি বই প্যাক্ করা! যদি মনের ইচ্ছার সঙ্গে এই সব স্থাবর বস্তু স্থান থেকে স্থানান্তরে চালান করা যেতো, তা'হলে আর কথা ছিলো না। দয়া করে চিঠি লিখবেন লম্বা ক'রে।

* * *

—লারমিনি স্ট্রীট
ওয়াড়ি, ঢাকা,
১৯ মে, রাত্রি

প্রীতিভোজনেষু,

লম্বা চিঠি লেখার হুকুম করেছেন। কাল আপনার চিঠি পেয়ে তেমনি একটা ঝোঁক হয়েছিলো, সত্য বলতে। কালই যদি লিখে ফেলতুম, তাহ'লে ধাঁ-করে খেলা হ'য়ে যেতো, তারপর ব'সে-ব'সে ফের আপনার চিঠি আসবার আশায় দিন গুনতে পারতুম। কিন্তু আজ আবার আপনার চিঠি পেয়ে আমার ভিতরটা যেন বিষম একটা ধাক্কা খেয়ে দুলিয়ে উঠছে। কাল যে-

সব ভালো-ভালো কথা মনে-মনে সাজিয়েছিলুম, কোথাকার একটা দস্যি হাওয়া এসে সেগুলোকে এক দমকে ওলোট-পালোট ক'রে দিয়ে গেল।

একটু বৃষ্টি হয়েছে ব'লে আপনি তো কত মন-খারাপ করছেন, এদিকে আমরা তাকিয়ে আছি হাঁ ক'রে আকাশের দিকে—হা-মেঘ, হা-মেঘ ছাড়া কারো মুখে কথা নেই, কিন্তু আকাশটা সারাদিন পাৎলা সীসের পাতের মতো ধ্বকধ্বক ক'রে জ্বলছে, আর রাতগুলো এমন চাপা যে নিঃশ্বাস পড়ে না। কখনো যদি একটু হাওয়া দেয়, মনে হয় ডিরেক্ট স্বর্গ থেকে চ'লে এলো ইন্দ্রাণীর অঞ্চল-তাড়িত হ'য়ে। কাগজ প'ড়ে জানা গেলো, মনসুন আসা তারিখ পার হ'য়ে গেছে···রাস্তার মধ্যিখানে সে বেচারীর কী অপঘাত ঘটলো, তা-ই ভাবছি। ক'ষে রাগ ক'রে আলিপুর আপিশের উদ্দেশ্যে কেউ একটা চিঠি লিখছে না কোনো পত্রিকায়, এতে অবাক না হ'য়ে পারছি না। আপনাকে বলিনি বাংলা কাগজের সেই সম্পাদকীয় মন্তব্যের কথা? সেবার হাওয়া-আপিশের ডক্টর সেন গিয়েছিলেন এক হিমালয়-অভিযানের সাহায্য। তা-ই নিয়ে বঙ্গ-জন-গণ-মনের সেই প্রতিনিধি যথেষ্ট ইনডিগনেশন সহকারে বলেছিলেন—"আমরা কলিকাতাবাসীরা গরমে পুড়িয়ে মরিতেছি, এদিকে ডক্টর সেন কী করতিছেন? তিনি পাহাড়ে গিয়া ঠাণ্ডা হাওয়া খাইতেছেন।"

সত্যি, কী অন্যায়! সেন-সাহেবের আপিসে বৃষ্টি তৈরির সব মাল-মশলা মজুত, তাতে তালাবন্ধ ক'রে তিনি কিনা পালালেন পাহাড়ে।

কিন্তু জানেন, আপনার যে মাঝে-মাঝে মন-খারাপ হয়, এটা জেনে মনের মধ্যে ভারী একটা আরাম পাচ্ছি। আমার যেন ধারণা হ'য়ে গিয়েছিলো আপনি সব সময়েই হাসিখুশি, ঝকঝকে, ফিট-ফাট ইন টিপটপ কণ্ডিশন। সেটা দেখতে ভালো সন্দেহ নেই, কিন্তু সেটা কিছু শৌখিন—পোশাকি, কী বলেন? আপনার সেই পোশাকি মানুষের সঙ্গেই আমার পরিচয়। তাকে যতই ভালো লাগুক, চলতে হয় সমীহ ক'রে। কিন্তু এই যে আপনি লিখেছেন মনটা আজ ভালো লাগছে না, এতে যেন এক ঝলকে আর-একজন মানুষের দেখা পাওয়া গেলো। সে-মানুষ আটপৌরে, সে-মানুষ প্রতিদিনের ঘরোয়া জীবনের চিরকালের চেনা। যার মন-খারাপ লাগে, এবং সে কথাটা যে স্বীকার করে, সে তখনই অনেকটা কাছে এসে যায়—তাকে তখনই চিনতে

পারি আমারই মতো হাজার সুখে-দুঃখে আশায়-ব্যর্থতায় জড়ানো একজন মানুষ ব'লে। যদিও সে পর মুহূর্তে সাবধান হ'য়ে যায়, পাছে পরে তাকে সইতে হয় ঠাট্টা-বিদ্রূপ।

হায় রে এখানে আমার যদি একদিন একটু মন খারাপও হ'তো। সেটা একটা পজিটিভ্ অবস্থা, সেটা বিশেষ কথা-কিছু। আমার এই ঘামে আর ঘুমে হাঁপিয়ে-ওঠা লম্বা দুপুরের শূন্যতা থেকে মস্ত রেহাই সেটা। ভাবছি, সাইকোলজির যে-সংক্ষিপ্ত সার আমার বাক্সের তলায় অবস্থান করছে, সেখানাই টেনে বের করি। পড়তে-পড়তে হয়তো দিব্যদৃষ্টি খুলে যাবে। এবং সেই দৃষ্টির জোরে নিজের ভিতরটা দেখতে-দেখতে এমন মুগ্ধ হ'য়ে যাবো, যে বাইরের জিনিসের কোনো অর্থই আর থাকবে না।

কিন্তু যদি মুগ্ধ না হই? যদি আতঙ্কে শিউরে উঠি?

সেইজন্যই মায়া দেবী, সেইজন্যই সাইকোলজির বই আমার খোলা হচ্ছে না প'ড়ে থাক বই, নিজের মনের মধ্যে কী আছে, তলিয়ে দেখে লাভ কী? শান্তশিষ্ট-ভদ্র চেহারা নিয়ে ঠাণ্ডা মেজাজে দিনগুলো কেটে গেলেই হ'লো। কিন্তু মেজাজটাও সবসময় ঠাণ্ডা রাখা যায় না, এই যা আপশোস। আচ্ছা, আপনি তাস খেলেন? যদি তাস খেলার প্রতি আপনার এমন একটা তীব্র বিতৃষ্ণা জ'ন্মে থাকে যে, তার চাইতে দুপুরবেলায় পুরোপুরি দু'ঘণ্টা ঘুমোলেও ভালো মনে করেন, আর কেউ যদি আপনাকে জোর করে সেই তাস খেলায় বসাতে চায়, তাহ'লে কেমন লাগে আপনার? আপনি দয়া ক'রে মার্ক টোয়েনের বই পাঠাতে চেয়েছেন। না-ই বা পাঠালেন। চাই না মজার বই, চাই না হাসতে—যদি মাঝে-মাঝে আপনার চিঠি পাই। কেমন এবার? দেখলেন তো, অভাজনকে প্রশ্রয় দিলে কেমন হয়? আর দু'দিন পরে হয়তো চিঠি না পেলে রাগই করবো। ভালো চান তো এখন থেকেই সামাল দিন।

পরের চিঠিতে জানাবেন বৃষ্টি কেটে গিয়ে ঝিকমিকিয়ে রোদ উঠেছে কিনা আকাশ ভ'রে। অনেকবার বৃষ্টি পড়বে, অনেকবার রোদ উঠবে বৃষ্টির পরে। হবে না শুধু মুখোমুখি চেয়ারে ব'সে দু'জনে গল্প করা, সমস্ত গল্পের পরে সোনায় ভ'রে ওঠা সেই চুপ-ক'রে থাকা।

টপসি কেমন আছে? তাকে আমার ভালবাসা দেবেন। 'সুমন্ত্র'—

পুনঃ—আচ্ছা, আপনি পেন্সিলে চিঠি লেখেন কেন? আর এমন শক্ত পেন্সিলে? আঙুল ব্যথা করে না? এত হাল্‌কা হ'য়ে লেখা পড়ে —প্রায়ই মাঝে-মাঝে কথা বুঝতে পারি না—প্রথমটায়, পরে অবশ্য বার-বার পড়ে অনেক খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে উদ্ধার করি—আপনার চিঠি থেকে একটি ছোটো কথা হারাতেও আমি রাজি নই।

* * *

শিলং
২১ মে,

সুমন্ত্রেষু,

নামের পর বহুবচন প্রয়োগ করাটা কেমন জানি না। কিন্তু মানুষের পক্ষে বহু চরণের অধিকারী হওয়াব চাইতে বহু নামের ভাগী হওয়া বরং সম্ভব —আর এক হিসেবে একথা বলা তো খুবই সংগত যে আপনি একজন সুমন্ত্র নন, অনেকগুলো সুমন্ত্র। জ্যাকল-হাইডের বিভাগটা চমকপ্রদ হ'লেও কিছুটা গায়ে-পড়া। আসলে প্রতি মানুষেব মধ্যে জ্যাকল ও হাইডের অসংখ্য স্তরবিভাগ পাশাপাশি লাফালাফি-দাপাদাপি করছে। যদি জ্যাকল হাইড-রূপী সুস্পষ্ট ও বিচ্ছিন্ন যুগল-কক্ষ নিয়েই মানুষের মনের রচনা হ'তো, তাহলে কী সহজই না হ'তো জীবন!

খুব বিজ্ঞের মতো কথা বললুম, এবার এটা শুনুন। প্রতিবারই বেড়াতে বেরোবার সময় জিনিসপত্র বাঁধা-ছাঁদা হ'তে থাকে, দুটি ক্ষুদ্র কিন্তু অতি প্রয়োজনীয় বস্তু সম্বন্ধে আমার মনের আশঙ্কা আর কাটে না। কেবলই ভয় হয় ফেলে যাবো—হয় টুথব্রাশ, নয় ফাউন্টেনপেন, নয় দুই-ই। সেইজন্য শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত ও-দু'টি জিনিস আমি চোখের সামনে কোথাও ফেলে রাখি, রওনা হবো হবো, এমন সময় তাদের কুড়িয়ে নিয়ে আর কোথায় জায়গা না হয় আমার ভ্যানিটি ব্যাগে। নামে 'ভ্যানিটি ব্যাগ' হ'লেও জিনিসটি কত যে কাজে লাগে, ভাবতে পারেন না। আপনাদের জামার পকেটকে যদি ভ্যানিটি পকেট বলি তাহ'লে কেমন হয়। এরারেও দেখুন, সরল বিশ্বাসে ও দু'টি জিনিস ড্রেসিং টেবিলের উপরেও রেখে টপসির ও নিজের প্রসাধন সমাপন করেছি—শেষ মুহূর্তে আমার সেই চিক্‌চিক্ কালো, ভায়োলেট কালি ভরা কলম এমন বিশ্বাসঘাতকতা করবে তা কে জানতো। এখানে এসে

দেখি নেই, নেই তো নেই। মনকে সান্ত্বনা দিলুম—থাকগে, কী-ই বা হ'তো কলম দিয়ে, টুথব্রাশটি যে দয়া ক'রে এনেছি সেইজন্যেই ঈশ্বরকে ধন্যবাদ। তারপর যখন আপনাকে চিঠি লেখার কথা মনে হ'লো, তখন হাতের কাছে প্রথমে যা পাওয়া গেলো, সেই শক্ত পেন্সিলটাতেই শুরু ক'রে দিলুম। এ-যন্ত্রটিকে লেখনী বলা যায় না, তবু এ অল্প অনায়াসে প্রমাণ করলে যে এর দ্বারাও অক্ষর আঁকা যায় অসময়ে। ইতি পেন্সিল-পর্ব।

এক হিসেবে ভালোই হ'লো। তবু তো আক্ষরিক অস্পষ্টতার জন্য আপনি একাধিকবার আমার চিঠিগুলো পড়েন? যদি হাতে থাকতো কলম, তবে সেই ঝক্‌ঝকে কালির আঁচড় সুবিধে হতো প্রথম দর্শনেই, এবং তার অনুশীলন প্রথম পাঠেই শেষ হ'তো। সুতরাং, যদিও চেষ্টা করলে কিছু কালি-কলম সংগ্রহ করা অসম্ভব নয়, তবু এই পেন্সিলের মায়া যেন কাটিয়ে উঠতে পারছি না। আঙুল ব্যথা করে বইকি—তা করুক।

বৃষ্টি কেটে গেছে। এখানকার বৃষ্টিটা যেমন বিশ্রী, তার কেটে যাওয়াটা আবার তেমনি সুন্দর। কে একজন অসম্ভব খুশি হ'য়ে সারা আকাশ ভ'রে হেসে ওঠে। তারপর কোথায় জুতো, কোথায় গায়ের জামা, কোথায় বর্ষাতি, চলো বাইরে। টপসি-টপসি, চল বেড়িয়ে আসি। অসম্ভব আনন্দ এখানে সুখী না-হওয়া বৃষ্টি কেটে গিয়ে যখন রোদ ওঠে। সাপের মতো আঁকাবাঁকা পাহাড়ের বুক-চেরা পথ চলতে-চলতে হঠাৎ একটা ঝরণা যেন কথা ক'য়ে উঠলো, আর চারদিকে পাইনের পাতায়-পাতায় অফুরন্ত দীর্ঘশ্বাস। যে রাস্তা আঁকা-বাঁকা তাতে অনেক রহস্য, কী আছে প্রতি বাঁকে, কী-না জানি আছে, বুকটা কাঁপে যেন। আধুনিক শহরের পথ-ঘাট জ্যামিতির রেখার মতো সরল। তার সুবিধে অনেক। রহস্যের-রোমাঞ্চের বদলে সুবিধের আরাম। আধুনিক সভ্যতা এইদিকেই চলছে প্রতি পদে। কলকাতার উত্তর অঞ্চলে এখনো আছে অনেক গলি, অদ্ভুত তাদের জটিলতা অদ্ভুত আলো-হাওয়ার খেলা দেখা যায় সেখানে। অনায়াসেই মনে করা যায়, রাত বারোটার সময় সাদা কাপড় পরা কোনো মূর্তি আপনার পিছনে এসে ফিস্‌ফিস্ ক'রে কথা কইবে, তারপর হঠাৎ মিলিয়ে যাবে সাদা দেওয়ালের গায়ে। ভাবছি, ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাস্ট-এর কাজ একেবারে শেষ হবার আগে সে-সব গলি ভালো ক'রে একবার ঘুরে আসবো—দু'একটা ভূতের দেখা যদি মেলে, গল্প করার

মতো কিছু হবে। (আমি ভূতে বিশ্বাস করি।)

কিন্তু জানেন, কাল আমি নিজেই প্রায় ভূত হ'তে চলেছিলুম। এমন সর্বনেশে এখানকার কুয়াশা, কে জানতো। এসে অবধি কুয়াশা-টুয়াশা বড়ো দেখিনি, ভেবেছিলাম অমনি বুঝি। কাল ভোরে উঠে দেখি—ওমা কিচ্ছু নেই তো, সব মুছে গেছে। বেরিয়ে পড়লুম তক্ষুনি কুজ্‌ঝটিকা আহার করতে। চেনা পথ দিয়ে অনেক দূর চ'লে গেলুম। নিজের হাত নিজেই দেখা যায় না। তারপর কুয়াশা খেতে-খেতে অন্য রকম খাদ্যের দিকে ইচ্ছে জাগলো—বাড়ির দিকে পা ফেরালুম। পা অনেকবার ফিরলো' বাড়ি কাছে এলো। কুয়াশা নামলো আরো ঘন হ'য়ে। সত্যিই কিছু আর রইলো না। তবু নিশ্চিন্ত, নির্ভয়ে চললুম, বাড়ি পৌঁছতে পারবোই—ভাবনা কী? কিন্তু হঠাৎ খেয়াল হ'লো, যে-পথ দিয়ে চলেছি সেটা অতি সংকীর্ণ, আর দু'দিকে খাদ নেমে গেছে অতি গভীর। এটা বুঝতে পারলুম নেহাৎই বুদ্ধিবৃত্তির জোরে, কেন না চোখে যতটা এবং যতদূর দেখা যায়—তা শুধুই বিশাল নিস্পন্দ কুয়াশার একটি সমুদ্র। বেশ ছিলুম অজ্ঞানে, কিন্তু এই চৈতন্যোদয় হবার পর থেকে যা অবস্থা হ'লো, সে আর বলবার নয়। একবার পা ফেলি আর মনে হয় এই বুঝি হ'লো মায়াদেবীর পাতাল প্রবেশ। দু'তিন হাজার ফুট নীচে পড়তে-পড়তে মাঝপথে জ্ঞান লুপ্ত হবে, সুতরাং মৃত্যুটা কষ্টের হবে না, এই কথা চিন্তা ক'রে মনকে যথাসাধ্য প্রবোধ দিলুম। মা'র কথা মনে পড়লো, বাবার কথা মনে পড়লো, আপনার কথা। কিন্তু কারো কথাই বেশি ভাববার সময় ছিলো না, মন-প্রাণের সবটুকু শক্তি নিঃশেষ হয়েছিলো প্রতিবারে প্রতিটি পা-ফেলায়।

যা-ই হোক, আমি যে এখন সশরীরে জীবিত, তা-তো দেখতেই পাচ্ছেন। মা-বাবাকে এখনো বলি নি কথাটা—বিরাট ভয়টা ম'নে আসতে আসতেও এখনো একটু একটু চিমটি কাটছে মনের মধ্যে। ভাগ্যিস্ সেদিন টপসি ছিলো না আমার সঙ্গে। শুভযোগে একদিন সেই রাস্তাটা আবার ঘুরে আসতে হবে। ধরুন, গিয়ে যদি দেখি কিছুই না, ও আমার মনের ভুল! সেই চীনে ডাকাতদের গল্প জানেন তো—এক শ্বেতাঙ্গ পুরুষকে তারা ধরলে, শাব্যস্ত হ'লো প্রাণদণ্ড। পরে সর্দার দয়া ক'রে বললেন—তোমাকে আমরা রেখে যাচ্ছি এই নির্জন পাহাড়ের চূড়োয়। যদি হাত পিছলে প'ড়ে যাও,

নীচে অতল মৃত্যু। আর যদি দৈবাৎ কেউ তোমাকে উদ্ধার করে তো প্রাণ নিয়ে ঘরে ফিরে যেয়ো, আমাদের আর ঘাঁটাতে এসো না। বেচারা ইংরেজ দু'হাতে প্রাণপণে আঁকড়ে ঝুলে রইলো সমস্ত রাত, একটুর জন্যে সে পা তুলে উঠতে পারে না, একটুর জন্যে পা বাড়িয়ে পায় না ওদিকের নিরাপদ আশ্রয়। এমনি ক'রে অন্ধকার রাত কেটে গেলো, তারপর ভোর যখন হয়-হয় মনে-মনে যীশুর নাম নিয়ে দিলে হাত ছেড়ে। সঙ্গে-সঙ্গে পড়লো হুমড়ি খেয়ে এক বালুর ঢিবির উপর। ভোরের আলোয় দেখা গেলো যে তার ঝুলন্ত পা দু'টোর ইঞ্চি কয়েক নীচেই ছিল বালুর নরম বিছানা।

টপসি ভালো আছে! বেজায় দস্যি হয়েছে এখানে এসে। কোথায় থাকে, কী করে, কোনো খোঁজই নেই শ্রীমানের। কেবল খাওয়ার সময়ে ঠিক এসে হাজির মূর্তিমান জঠরানল। কী ক'রে টের পায়? দার্শনিকের উল্লিখিত ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় কি এই? আমরা যখন হাত থেকে মুখে খাদ্য চালনা করি, এমন অনিমেষ নয়নে মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে যে সে একটা দেখবার জিনিস। খাওয়া হ'লো তো আবার ছুট। হয়তো রান্নাঘরের দরজায় উঁকি দিয়ে পরবর্তী ভোজনের আয়োজন পর্যবেক্ষণ ক'রে এলো। যদি ডাকতে পারলুম—টপসি! টপসি! দৌড়ে ছুটে এসে হা-হা ক'রে ঝাঁপিয়ে পড়লো কোলে। খুব ভালো টপসি। আপনি কেমন আছেন, সব জানাবেন।

মায়া

* * *

ঢাকা,
২৫শে মে

কেমন আছি বলতে গেলে অনেক কথাই বলতে হয়। সে-সব কথা থাক্। সম্প্রতি কলেজ যাওয়ার প্রধান আকর্ষণ আমার পক্ষে এই হ'য়ে উঠেছিলো যে, সেখানে আপনার সঙ্গে দেখা হবে এবং আমার এখানকার জীবন ধারণের প্রধান আকর্ষণই এই যে, সপ্তাহে দু'বার আপনার চিঠি পাই। এক হিসেবে বোধহয় ভালোই হয়েছে যে আমার শিলং যাওয়া হয়নি। এই চিঠিগুলো তবে কোথায় পেতুম? কতদিন কত কথা তো হয়েছে আপনার সঙ্গে—কিছু মনে আছে? কিছু কি ধ'রে রাখতে পেরেছি কোনোখানে?

সময়ের স্রোতে খড়কুটোর মতো ভেসে গেছে ওরা। কিন্তু আপনার এই চিঠিগুলো রইলো, রইলো আমার বাক্সের তলায়, রইলো আমার মনের তলায়, চুরি ক'রে লুকিয়ে রেখে দিলুম দস্যু সময়ের হাত থেকে ছিনিয়ে—আপনার এই যেমন-খুশী-বলা, মনে-ঢেউ-তোলা, পেন্সিলে লেখা অপ্রস্তুত চিঠিগুলো। আপনি হয়তো জানেন না—

উঠে যেতে হয়েছিলো। পিতৃদেবের তলবে। ফিরে এসে আর-কোনা কথা খুঁজে পাচ্ছি না! বৃথা মানুষ নিজের মন নিয়ে গর্ব করে—সে মন তো এক টুকরো মেঘের মতো, আকাশের অসংখ্য হাওয়ার শখের খেলনা মাত্র। আপনার চিঠির হাওয়ায় যে মন চলেছিলো পাখা মেলে স্বর্গের দিকে, পৈতৃক অনুশাসনের ধাক্কায় তা এখন পাতালগামী। যেন একটা পাখা ভাঙা এরোপ্লেন ঝাপটে ঝাপটে ডুবছে, নীচে রয়েছে হাঁ ক'রে অতল কালো জল।

'সুমন্ত্র'

* * *

'তোকে শিলং থেকে কে এত চিঠি লেখে রে ঘন ঘন? মেয়েলি হাতের লেখা মনে হয়।'

আপিশঘর। মক্কেলরা আজ একটু সকাল সকালই বিদায় নিয়েছে। হাতে সময় আছে, হৃষীকেশবাবু ডেকে পাঠালেন জ্যেষ্ঠ পুত্রকে। ঈষৎ দোমড়ানো ফিনফিনে পাঞ্জাবী গায়ে সুমন্ত্র ঘরে ঢুকলো। এবার এসে এ-ঘরে এই প্রথম তার পদার্পণ। দেয়ালের গা ঘেঁষে কাঁচের আলমারির সারি বৃহদাকার আইন-গ্রন্থে ঠাসা; এক-একখানা বই এক বছরের শিশুর মতো ভারী! ঘড়ি টিক্‌টিক্ করছে আইনজ্ঞের মুখোমুখি দেয়ালে। পিতা-পুত্রের মধ্যবর্তী বিরাট সেক্রেটারিয়েট টেবিলে দলিল পত্রের ঠেসাঠেসি ভিড়। হৃষীকেশবাবুর সামনে একখানা কাগজ, সুমন্ত্র যখন ঢুকলো তাঁর চোখ ও মন তারই অধ্যায়নে নিবদ্ধ। ছেলের পায়ের শব্দ শুনে চোখ না-তুলেই তিনি তাঁর পেশাদারী ঢঙে বললেন, বোসো তোমার সঙ্গে কথা আছে।'

সুমন্ত্র বসলো। নিজেকে শক্ত ক'রে নিলো ভিতরে-ভিতরে। প্রবীণতার দৃশ্যে ঘাবড়াবে না সে, গম্ভীর-বিজ্ঞতার মুখোমুখিত্বে ভয় পাবে না। এমনি কাটলো খানিকক্ষণ। তারপর হৃষীকেশবাবু কাগজটা সরিয়ে রেখে চোখের চশমা নামিয়ে সুমন্ত্র'র দিকে তাকালেন। হালকা সুরে বললেন, 'তোকে

শিলং থেকে কে এত চিঠি লেখে ঘন-ঘন ? মেয়েলি হাতের লেখা মনে হয়।'

এমনভাবে বললেন কথাটা যাতে স্পষ্টই বোঝা যেতে পারে এটাই আসল কথা নয়, এটা আকস্মিক প্রসঙ্গমাত্র—যেন হঠাৎ মনে প'ড়ে গেলো, এমনি ভাব। সুমন্ত্র বললে, 'আমার এক বন্ধু। ওর হাতের লেখা মেয়েলি।'

'বন্ধু—কোথাকার বন্ধু ?'

'কলেজের। একসঙ্গে পড়ি আমরা।'

'ও। সে শিলং গেছে বুঝি ছুটিতে ?'

'আমিও যেতে চেয়েছিলুম সেইসঙ্গে।'

'যেতে চাওয়াটা অন্যায় হয়েছিলো, তা আমি বলবো না। আর একজনকে দেখলে ও'রকম শখ হয়ই তোমার বয়সে। তবে তুমি তো এখন আর নিতান্ত ছেলেমানুষ নও। তুমি বুদ্ধিমান, তোমার বয়সের সাধারণ ছেলের চাইতে তোমার চিন্তাশক্তি কিছু বেশি। টাকা-পয়সার দিকটা এখন কি তোমার ভাবা উচিত নয় ?'

'গেলে তো ওদের বাড়িতেই থাকতুম, কেবল যাওয়া-আসার খরচটা। সে আর এমন কী। এখানেও তো এলাম।'

'তুমি কি বলতে চাও সারা ছুটিটা তুমি ওখানেই কাটাতে ? এখানে আসতেই না ?'

সুমন্ত্র চুপ ক'রে রইল। হৃষীকেশবাবু তীক্ষ্ণ চোখে ছেলের দিকে তাকালেন, 'মন্ত্র, তোমার মধ্যে একটা জিনিস লক্ষ্য ক'রে আমি বড়ো দুঃখিত হয়েছি। তোমার পরিবারের প্রতি তোমার একেবারেই সহানুভূতি নেই।'

'পরিবারের সঙ্গে আমার সম্পর্ক কী ?'—কথাটা প্রায় সুমন্ত্রর মুখে এসে পড়েছিলো, কিন্তু নিজেকে সামলে নিয়ে সে বললে, 'কী করলে তোমাদের বিশ্বাস হবে যে, আমার সহানুভূতির অভাব নেই ?'

হৃষীকেশবাবু ঠোঁট বাঁকিয়ে হাসলেন। বললেন, 'তুমি যদি সহানুভূতি দেখাতে যেতে, আরো বেশি দুঃখিত হতুম। কিন্তু তোমার প্রাণে যে কেন এক ফোঁটা দরদ নেই, সেটাই আশ্চর্য।'

সুমন্ত্র কোনো জবাব দিল না।

'এই একটা কথাই ধরো,' হৃষীকেশবাবু তাঁর পক্ষে আশ্চর্য শান্তভাবে বলতে লাগলেন, 'তুমি আমার কাছ থেকে চল্লিশ টাকা নাও মাসে-মাসে।

স্কলারশিপ পাও কুড়ি টাকা। বাংলাদেশে ষাট টাকা অনেক কেরানীরও আয় নয়। তুমি কলেজে পড়ো, থাকো হস্টেলে! কী করো এত টাকা?

'খরচ করি', সুমন্ত্র নিশ্চিন্তভাবে কথাটা বললে, চোখের পলকও পড়লো না।

হঠাৎ টেবিলে প্রচণ্ড চড় দিয়ে গর্জন ক'রে উঠলেন হৃষীকেশবাবু, খরচ করো! কী তোমার এত খরচ! এতেও তো তোমার চলে না। এটা-ওটা ছুতো ক'রে প্রতি মাসেই তো বেশি টাকা চেয়ে পাঠাও। গোপনে নাও তোমার মা'র কাছ থেকে। না-পেলে আবার রাগ করতেও শিখেছো।'

সুমন্ত্র একটু চুপ ক'রে রইলো, বাবা আর কিছু বলেন কিনা বোধহয় সেই অপেক্ষায়। তারপর আস্তে বললে, 'কলেজের মাইনে আর হস্টেলেই তো তিরিশ টাকা যায়।'

'আর? তোমার আর কী খরচ, শুনি'।

'আর খরচ নেই মানুষের? আমি কি একটা পশু নাকি?'

'আর যা খরচ, তা পাঁচ টাকাতেই কুলিয়ে যাওয়া উচিত। বেশি ক'রে দশ টাকাই ধরলুম না-হয়। আমরা যখন কলেজে পড়তুম—'

'সে-কথা বারংবার বলো কেন? তোমাদের সময় আর নেই, দিনকাল বদলে গেছে—'

'তা বুঝতে পারছি। যত সব দায়িত্বজ্ঞানহীন-উড়নচণ্ডী-নির্বোধ—'

'বেশ, হিসেব চাও তো তো হিসেব দিচ্ছি,'—বলে বেশ উচ্চস্বরেই সুমন্ত্র জবাব দিলে। 'দু'বেলা চা খাওয়া আছে, এবং চা মানে শুধুই চা নয়—'

'কত তোমাদের খাওয়ার দিকে নজর, তা-তো জানি! খাও তো রেস্টোর‍্যাণ্টে গিয়ে সাপের চর্বিতে ভাজা কুকুরের চপ—'

'কোথায় পাবো আর? বিশুদ্ধ গব্য ঘৃতে মুরগীর কাটলেট কে আমাকে ভেজে দেবে?'

'তোমার পিসেমশাই আছেন কলকাতায়, তোমার হস্টেল থেকে দূরও নয় তাঁর বাসা। কথা ছিলো, তুমি কলেজ থেকে তাঁর ওখানে গিয়ে বিকেলের খাওয়াটা খাবে—'

সুমন্ত্র ঘাড় বাঁকিয়ে বললে, 'পরের বাড়িতে রোজ-রোজ খেতে আমার লজ্জা করে।'

'আহা—তাঁরা তো অক্ষম নন, অনিচ্ছুকও নন। কত খুশি হয়, সবাই তুমি গেলে। আর অনাদিবাবু আমাকে লিখেছেন, চার মাসের মধ্যেও তুমি তাঁর ওখানে যাও নাই তিনিই বুঝি একদিন হস্টেলে গিয়েছিলেন তোমার দর্শন মেলেনি।'

'ও বাড়িতে আমার ভালো লাগে না।'

'ভালো লাগে না! ওরা কিনা ভালোবেসে—'

'আপন? আত্মীয়। আত্মীয় হ'লেই কি আপন হয়? আত্মীয় ভালো লাগতে হবে, মানুষের উপর এ-কী অন্যায় জবরদস্তি!'

হৃষীকেশবাবু স্তম্ভিত হয়ে ছেলের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন। বললেন, 'তোমার কথা শুনে মনে হচ্ছে উচ্চশিক্ষার যোগ্য তুমি নও। কেবল বইয়ে-পড়া বুলি—'

অসহিষ্ণুভাবে মাথা ঝেঁকে ব'লে উঠলো সুমন্ত্র, 'কাকে ভালো লাগবে না, সে কথাও কি বইতে লেখা থাকে নাকি? তুমিও তো কোনোদিন বই-টই পড়েছিলে।

হৃষীকেশবাবু লম্বা নিঃশ্বাসে অনেকখানি বাতাস বুকের মধ্যে টেনে নিলেন। তারপর বললেন, 'পড়েছিলাম—কিন্তু—' হঠাৎ সমস্ত বাঁধ ভেঙে তিনি গর্জন ক'রে উঠলেন 'কিন্তু বেশি পড়িনি যাতে তোমার মতো নির্বোধ-দাম্ভিক-গর্দভ হ'তে পারি!'

ঝাঁ ঝাঁ ক'রে উঠলো সুমন্ত্র'র মুখ; টুকটুকে কান নিয়ে মাথা নীচু করে রইলো সে।

'আর তোমাকে নিয়ে কত কিছু আশা করেছিলুম আমি। ভুল হয়েছিলো তোমাকে কলকাতা পাঠানোই—স্বাধীনতা তোমার সইলো না।'

সুমন্ত্র হঠাৎ ব'লে উঠলো তীব্র ভঙ্গিতে মাথা ঝেঁকে, 'কেন এ-কথা বলছো তুমি? কী করেছি বলোতো আমি?'

'উচ্ছন্নে যাচ্ছো—অতি অল্প কথায় এই হচ্ছে তোমার অবস্থা।'

ঝলসে উঠলো সুমন্ত্র'র চোখ একটা চাপা বিদ্যুৎ আহত সাপের মতো লাফিয়ে উঠলো যেন—'কেন, কী করেছি আমি? কী করেছি? কেন এ-সব যা তা বলছো আমাকে? যা তোমাদের মুখে আসে, তা-ই যে আমাকে বলতে পারো, তা-তো এই কারণেই যে আমি তোমার কাছ থেকে টাকা

নিই ? বেশ, নেবো না আমি তোমার টাকা আর নেবো না। নিজের ব্যবস্থা নিজেই ক'রে নেবো।'

এমন একটা ধাক্কা লাগলো হৃষীকেশবাবুর, বুকের মধ্যে টনটন ক'রে উঠলো। মন্তু আজ এ-কথা বলছে, মন্তু! কিন্তু পরমুহূর্তেই ব্যথা গেলো কেটে, ঠেলে উঠলো রাগের স্রোতে, রাগের লাল জোয়ারে তিনি অন্ধ হয়ে গেলেন। মারতে পারতেন তিনি, তাঁর এই অবাধ্য-উদ্ধত ছেলেকে হাত তুলে মারতে পারতেন, যদি না হঠাৎ তাঁর রাগ ফেটে পড়তো অট্টহাস্যে। সে-হাসি এমনি আকস্মিক ও অদ্ভুত, যে সুমন্ত্রও চমকে কেঁপে উঠলো।

'এতক্ষণে তুমি প্রমাণ করলে যে তুমি সত্যি মূঢ়। তোমাকে টাকা দিয়ে আমি তোমাকে যা-তা বলবার অধিকার উপার্জন করছি! তুমি আমার চাকর কিনা। আর্থিক একটা বাধ্য-বাধকতা আছে ব'লেই তুমি—'

হৃষীকেশবাবুকে কথা শেষ করতে না দিয়ে সুমন্ত্র ব'লে উঠলো: 'টাকার হিসেব চাইতে তো ভোলো না তুমি—'

'একশোবার চাইবো!' হৃষীকেশবাবু এমন এক ঘুষি মারলেন টেবিলে যে কাঁচের কাগজ-চাপাগুলো ছিল নেচে উঠলো। 'আমার টাকা, তার হিসেব একশোবার চাইবো আমি। তোমার মঙ্গলের জন্যও সেটাই দরকার। কার রক্ত-জল করা টাকা অনায়াসে সিগারেটের ধোঁয়া ক'রে তুমি উড়িয়ে দাও, একবার ভেবেছ সে-কথা।'

ঠোঁটের এক কোণ কামড়ে সুমন্ত্র বললে 'কারো রক্ত-জল-করা টাকাই নয়, আমার টাকা।'

'তোমার টাকা!' হৃষীকেশবাবু এমন সুরে কথাটা বললেন যে সুমন্ত্র'র চোখ তুলে তাকিয়ে বলতে রীতিমতো শক্তি ও সাহসের প্রয়োজন হ'লো।

'আমার টাকা। আমার স্কলারশিপের টাকা।'

'বদখেয়ালে ওড়াবার জন্যেই তোমাকে স্কলারশিপ দেয় না?'

'যারা ওটা দেয়, তারা দিয়েই দেয়, হিসেব চায় না। আর কিছু দ্যাখে না তারা, খালি পরীক্ষার নম্বর দ্যাখে।' উজ্জ্বল উত্তেজিত চোখ তুলে সুমন্ত্র তার বাবার দিকে তাকালো। এখানে তার জয়, তার শ্রেষ্ঠতা। পরীক্ষায় তার উঁচু নম্বর, হাজার ছেলের মধ্যে অনায়াসে সে পয়লা মার্কা। আর যা-ই হোক, তার এ-গৌরব তো কেউ কেড়ে নিতে পারে না।

হৃষীকেশবাবু চেয়ারে হেলান দিয়ে একটু চুপ ক'রে রইলেন। তারপর মুখের উপর একবার হাত বুলিয়ে বলতে লাগলেন।

'তুমি ইতিমধ্যেই "আমার" আর "তোমার" টাকা আলাদা ক'রে দেখতে শিখেছো। তা যদি না-শিখতে, তা'হলে হয়তো তোমার মনে হ'তো যে এর কমেও চলে। হয়তো আমার কাছ থেকে যতটা বেশি পারো, আদায় ক'রে নিতে না। হয়তো একবার ভাবতে, অত বড়ো সংসার কেমন ক'রে চলে। মনে করতে পারতে, যে আমার আগের মতো রোজগার আর নেই, নেই কোনো সঞ্চয় এবং শীগগিরই তোমার একটি বোনের বিয়ে দিতে হবে।'

'এত কথা কেন বলছো? আমি তো রাজিই আছি—আমাকে আর টাকা পাঠিও না।'

'স্ত্রীলোকের মতো অভিমান করো না, পুরুষ হ'তে শেখো। তোমার কি মনে হয় না, সত্যি সত্যি তুমি বেশি খরচ করো?'

'বেশি!' সরল বিশ্বাসের সুরে সুমন্ত্র বললে। 'কিছুই না অভাব আমার লেগেই আছে।'

'ও অভাব তোমার নিজের সৃষ্টি, কখনোও ঘুচবে না—যদি না তুমি অভ্যাস বদলাও। ক'টা ছেলে তোমার মতো খরচ করে, শুনি?'

'অনেক ছেলে আরো অনেক বেশি করে। বাজে খরচ শ' খানেক টাকা করে এমন ছেলেও পড়ে আমাদের কলেজে।

মুহূর্তকাল চুপ করে থেকে হৃষীকেশবাবু বললেন, মন্তু, তুমি তো ধনীসন্তান নও। আর যদি হতেও তবু ও'রকম মস্তিষ্কবিহীন অপব্যয়ের প্রশ্রয় দিতে পারতুম না আমি।'

'অপব্যয় কেন? ধরো আমি বই কিনতে চাই, ধরো আমি দেশ বিদেশে বেড়াতে চাই। চাই মানুষের মনের পরিচয়। তার জন্য যদি টাকা লাগে?'

'মন্তু তুমি নিজে বড়ো হবে, কোনো ইচ্ছাই হয় তো তোমার অপূর্ণ থাকবে না। মন্তু, মাথাটা একটু ঠাণ্ডা করো, আমাদের দিকে একটু তাকাও।'

সুমন্ত্র'র মাথা-ঝাঁকুনিতে একগোছা চিকচিকে কালো চুল তার কপালের উপর লাফিয়ে পড়লো। বললো 'আমি কী করলে তোমরা খুশী হবে, তা বুঝি না। আমাকে কষ্ট ক'রে যদি থাকতে বলো, তা পারি না ভেবো না। বাধ্য হ'লে সকলেই কষ্ট করে। কিন্তু বাধ্য না হ'লে কষ্ট ক'রে কে? আমি

এমন কিছু প্রচণ্ড বিলাসিতায় ডুবে থাকি না, যাতে এত সব কথা আমাকে শোনাতে পারো। আমি যে রকম থাকি, যে রকম চলি, সে রকম না হ'লে আমার চলে না। সেটা অনেক দিনের অভ্যেসের ফল। সে অভ্যেস করিয়েছো তোমরাই। ফর্সা জামা-কাপড় না পরলে আমার চলে না, বন্ধুদের মাঝে মাঝে না খাওয়ালে আমার চলে না। চলে না সিনেমা না দেখলে। চলে না এটা ওটা অনেক কিছু না হ'লে না সেটা আমার দোষ নয়। আমার যে রকম জন্ম, যে রকম শরীর মন, যে রকম শিক্ষা, তাতে ওগুলো প্রয়োজন। কত ছেলে কত কষ্ট ক'রে পড়ে, তা কি আমি চোখে দেখি না? কত লোক কত দীনভাবে থাকে, তা জানি না আমি? কিন্তু আমি কি পারি ও রকম থাকতে? আর কেনই বা থাকবো—তেমন দুরদৃষ্ট নিয়ে যখন জন্মাইনি? দুঃখী হওয়াটাই তো মহৎ কথা নয়, যে যতটা পারে, সুখী হওয়ার চেষ্টাই তো করে সকলে।'

হৃষীকেশবাবু খানিকক্ষণ চোখ বুঁজে চুপ ক'রে রইলেন।

'শোনো, আমার বাবা যখন মারা যান, তখন আমার আঠারো বছর বয়স। কলেজে পড়ি। আমার বাবা দরিদ্র ছিলেন, কিন্তু নিরন্ন ছিলেন না; এবং তাঁর অন্নে আত্মীয় কুটুম্ব, জ্ঞাতি গোষ্ঠীর ঠিক আমারই সমান অধিকার ছিলো। তারও বেশী—আমরাই ছিলাম অতিথি আশ্রিত উপযাচকের প্রমাদজীবী। যে যা খেতে চায় খাবে, আমরাই কখনো কিছু চাইতে পারবো না। সকলের শোবার ব্যবস্থা হ'য়ে গেলে যেখানে সেখানে আমাদের বিছানা। নিজের ছেলেমেয়ে ব'লে কখনো বিশেষ কোনো যত্ন হ'তো না, নিজের ছেলেমেয়ে ব'লেই হ'তো না। অতিথির কোনরকম অনাদর করা যায় না, নিজের ছেলে তো নিজেরই ছেলে।'

এখানে সুমন্ত্র ব'লে উঠলো, 'শুনেছি আগে এ সব কথা।'

'আবার শোনো তোমাদের একালের কথা শুনলাম, আমাদের সেকালের কথা কিছু শোনো। বাপ তো মরলে একটা পয়সা রেখে গেলেন না। রইলো বিধবা মা, বিবাহযোগ্যা বোন। একটা সংসার পড়েছে আমার মাথায়। কলেজ ছেড়ে মাষ্টারী নিলুম গ্রামের স্কুলে। কুড়ি টাকা মাইনে দেশের জমিজমা বেচে বোনের বিয়ে দিলুম। মাষ্টারীর ফাঁকে-ফাঁকে পরীক্ষা দেয়া, কত কষ্টে জমতো ফী-এর টাকা। এমনি ক'রে বি, এ, পাশ করলুম,

পাশ করলুম বি, এল। ততদিনে স্কুলে তিরিশ টাকা মাইনে পাই। টিঁকে থাকলে হয়তো এতদিন হেডমাষ্টারই হ'য়ে যেতাম।'

হৃষীকেশবাবু তিক্ত, শুষ্কভাবে হাসলেন। আরো কথা বলবার তাঁর নিশ্চয়ই ইচ্ছে ছিলো, কিন্তু, কথাটা যেন শেষ হ'য়ে গেছে, এমনিভাবে সুমন্ত্র ব'লে উঠলো। 'তোমার অদৃষ্টে তুমি কষ্ট পেয়েছো। সেটা কি আমার দোষ, যে সে-জন্য আমাকে প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে?'

'সমস্ত জীবন দু'হাতে একা যুদ্ধ করেছি একটু ভর দিয়ে দাঁড়াবার কখনো কেউ ছিলো না। এখন মনে এ-রকম একটা আশা হয় যে, তোমরা আমার দুঃখ বুঝবে।'

'কিন্তু এখন তো তোমার কোনো দুঃখই নেই।'

'এখনো চলছে যুদ্ধ। বয়স হ'য়ে আসছে! এই মস্ত সংসার, মেয়ের বিয়ে আসছে সামনে—তার উপর তোমরা যদি এক-একটি উড়নচণ্ডী হ'য়ে ওঠো—নিজে আমি এ-বয়স পর্যন্ত হিসেব ক'রে চলেছি, আর তুমি আমার ছেলে এখনই তোমার গরমের দিনে পাহাড়ে না-গেলে চলে না, এখনই তোমার চল্লিশ টাকার সিগারেট লাগে মাসে! এ-পর্যন্ত তোর পিছনে যত টাকা খরচ হয়েছে, ক'টা বড়োলোকের ছেলের তা হয় রে? আর তুই এত বড়ো স্বার্থপর গোঁয়ার যে, নিজের কোনো সুখ একটু বাধা পড়লেই পাল্টে আমারই উপর রাগ করিস।'

'চুপ করো বাবা, চুপ করো, আর শুনতে চাইনে—' সুমন্ত্রর লাফিয়ে উঠে দাঁড়ালো, তার মুখ আগুনের মত লাল, বিপর্যস্ত, উদভ্রান্ত চুল। 'কেন করেছিলে খরচ, আমি বলেছিলুম করতে? আমি চেয়েছিলুম পৃথিবীতে আসতে? আমি একটা মস্ত খরচ, এ-কথাই তো এতক্ষণ ধ'রে বোঝালে? কিন্তু এ-খরচটা কেন হ'লো? কে দায়ী আমার অস্তিত্বের জন্য? এই মস্ত সংসার কার? প্রতিদিন একটু-একটু ক'রে আমার উপর এই রকম অত্যাচার করবার চাইতে একবার বলে দাও—আমি চ'লে যাই যেদিকে আমার খুশি।'

একটা বোমা ফাটলো। 'যাও-যাও, এক্ষুনি যাও, বেরিয়ে যাও আমার চোখের সামনে থেকে। উচ্ছন্নে যাও, জাঁহান্নামে যাও, যাও যেখানে তোমার খুশী। তোর অস্তিত্বের জন্য দায়ী কে, তা তোর মুখ থেকে আমাকে শুনতে হবে না। তুই আমার ঘোরতর অপকর্ম—তোর জন্মের সময় আমার আনন্দ

রাখবার জায়গা ছিলো না ; আজ দেখছি, সে-জন্ম না-হলেই ভালো হ'তো। একটা কথা তোকে ব'লে দিচ্ছি এই, মুহূর্তের জন্যও ভাবিসনে, যে আমি তোর কাছে কোনো-রকম প্রত্যাশী। ঈশ্বর করুন,'—বলতে-বলতে হৃষীকেশবাবু উঠে দাঁড়ালেন, 'ঈশ্বর করুন, কোনোদিন যেন কারো কাছ থেকে নিতে না হয়। আঠারো বছর বয়স থেকে এ-পর্যন্ত নিজের পায়ে নিজে চ'লে এসেছি কারোর তোয়াক্কা রাখিনি। এ শরীর যতদিন টিঁকে আছে কিছু ভয় করি না। ঈশ্বর করুন, মৃত্যুর দিনপর্যন্ত এমনি যেন খেটে খেয়ে যাই ··আর-কিছু চাই না আমি। তুই বুঝি ভেবেছিলি, আমি তোর কাছে কিছু চাই—তাই জানিয়ে দিলি কে-কার জন্য দায়ী ? ছি-ছি-ছি, আমিও এমন বোকা তোকে এ-সব কথা বলতে গিয়েছিলুম। যা-যা, এক্ষুনি চ'লে যা তুই এখান থেকে—' হৃষীকেশবাবু কাঁপতে-কাঁপতে চেয়ারে ব'সে পড়ে বললেন।

* * *

দিনের শেষ। গ্রীষ্মের দীর্ঘ গোধুলি সমস্ত শহরের উপর একটা রঙীন কুয়াশার মতো ছড়িয়ে পড়েছে। ঘরে আলো কম, কিন্তু আকাশে চলেছে লাল আভার লীলা। দোতলায় অরুণার কোণের ঘরে পশ্চিমের দু'টো জানালা খোলা আকাশের আভা লেগেছে সাদা দেয়ালে লেগেছে একটি সরু সোনালী ফিতে অরুণার কালো চুলে। তার মাথা আনত, হাঁটুর উপর কনুই আর গালের উপর হাত রেখে ব'সে আছে সে। মুখ ফেরানো, স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে চুলের একটু বাঁ দিকে তার সিঁথি, যেন একটি আশ্চর্য পথ দুরাশার দিগন্তে গিয়ে মিশছে। তেমনি লাগছিল অশোকের চোখে, তেমনি কাঁপছিলো অশোকের বুকে অরুণার পাশে ব'সে ঝিকিমিকি গোধুলি-বেলায়। কিছু বলা হয়েছে দু'জনের মধ্যে তারপর দু'জনেই চুপ।

এতক্ষণে অশোক নিঃশ্বাসের স্বরে বললে—'অত ভাবছো কী ?'

অরুণা কিছু বললে না। অশোক দু' আঙুলে তার বাহু ঈষৎ স্পর্শ ক'রে বললে' ,বলো না, কী ভাবছো।'

অরুণা মুখ ফেরালো। তার চোখের নীচে একটা লুকোনো ভয়ের ছায়া লাফিয়ে উঠলো যেন। আবার বললে অশোক; 'এত ভাববার কী আছে ?'

অরুণা ম্লান হেসে কপালের উপর হাত বুলোলো একবার। একটু কাটলো চুপচাপ।

'শোনো-শোনো অরুণা, থেমে-থেমে, মুখ দিয়ে নিঃশ্বাস টেনে-টেনে বললে অশোক, 'শোনো, আমার দিকে তাকাও।'

'কী, বলো?' আধখানা মুখ ফিরিয়ে অরুণা বললে।

'তুমি নিজে দেখেছিলে চিঠিটা?' কথাটা খুবই সহজ সুরে বলা হ'লো, কিন্তু স্পষ্ট বোঝা গেলো, তার পিছনে কঠিন প্রচেষ্টা।

'বললাম তো,' অরুণার গলা প্রায় বুঁজে এলো, এটুকু বলতে।

'চিঠি একটা লিখলেই তো আর কিছু হ'য়ে গেলো না, অশোক ক্ষীণ হাসলো। তারপর আরো স্পষ্ট করে হেসে, 'বললে তুমি দেখছি মূর্তিমতি ট্র্যাজেডি হয়ে উঠলে এরই মধ্যে।'

পাত্‌লা একটু হাসি খেলা ক'রে গেলো অরুণার ঠোঁটে। অশোকের মুখের উপর তার কালো চোখের ঝলক তুলে বললে, 'বলো, আরো বলো।'

'আমি তো ততক্ষণ ধ'রেই বলবার চেষ্টা করছি,' এবার সত্যি-সত্যি হালকা হ'লো অশোকের স্বর। 'অন্যের চিঠি বিনা অনুমতিতে পড়া ন্যায়সংগত নয়, তবে এবারের মতো তোমার এই ত্রুটি ক্ষমা করা যাচ্ছে। জানা রইলো, প্রস্তুত থাকবো।'

মাথা ঝেঁকে ব'লে উঠলো অরুণা 'কী ক'রে পারো। কী ক'রে পারো এমন হালকা সুরে কথা বলতে!'

'এখন যদি হালকা হ'তে না পারি, তাহ'লে তো ম'রে যাবো। শোনো, আমাদের অস্ত্রশস্ত্র সৈন্য-সামন্ত সব প্রস্তুত রইলো। ঠিক সময় তার একটা নোটিস দিতে ভুলো না।'

হঠাৎ, অকারণে, অশোকের মনটা ফুর্তিতে উপচে পড়ছিলো যেন। সর্বনাশের মুখে এমনি হয় বুঝি। নেশার মতো লাগে। কেন না ভয় পেতে আরম্ভ করলে ভয়ের শেষ নেই, কাঁদতে আরম্ভ করলে কান্না শেষ হবে আত্মবিলাপে। বিপদের মুখে যে উত্তেজনার উল্লাস, যৌবনের রক্তে আছে তার সুর। যৌবনই জানে হতাশার বুকে বুক চেপে কেঁদে মরতে, যৌবনই পারে উচ্চহাসির উদ্দাম পাখায় হতাশার পাতাল পার হ'য়ে যেতে।

'নাটক রয়েছে সাজানো, এবার পরদা উঠলেই হয়,' উপমা বদল ক'রে অশোক আবার বললো, 'তোমার পার্টটা মনে আছে তো অরুণা?'

'কী বলছো তুমি? কী ভাবছো তুমি?' অদ্ভুত ভাঙা-ভাঙা গলায়

অরুণা ব'লে উঠলো।

'তুমি যা ভাবছো, আমিও তা-ই ভাবছি। তুমি বলতে পারছো না, আমি বলছি।'

'সত্যি-সত্যি ?'

'সত্যি-সত্যি-সত্যি। তুমি বোঝো না, তুমি জানো না ?'

আর হঠাৎ যেন রূপান্তরিত হ'য়ে গেলো অশোক-অরুণার চোখে। সেই ছায়া-ভরা আলোয় এমন সুন্দর সে দেখলো অশোককে, যেন আর কখনো ছাখেনি। মুগ্ধ হ'য়ে তাকিয়ে রইলো।

'ভয় করে তোমার ?' কানে-কানে বলার মতো অশোক বললে।

'যদি বলি করে, তবে কি খুব রাগ করবে ?'

'ভয় করো না, কোনো ভয় নেই।' অশোক আস্তে-আস্তে অরুণার করতল একটু স্পর্শ করলে, থরথর ক'রে কেঁপে উঠলো অরুণার বুকের ভিতর।

'অবাক লাগে আমার,' অরুণা যেন একটা মূর্ছার ভিতর থেকে বলতে লাগলো—'কোথায় পাও তুমি এই সাহস; কোথায় পাও এই শক্তি ?'

'কোথায় পাই !' অশোক অরুণার ঘন চুলের মধ্যে আঙুলগুলো চালিয়ে দিলে। 'পাই ঐখানে, তোমার ঐ নরম ছোটো-ছোটো আঙুলের আগুনের শিখায়। তুমি যাকে বলছো সাহস আর শক্তি, এ-কি আমার ! পাগল, এত জোর কি আছে আমার মধ্যে !'

'তবে ?' রুদ্ধশ্বাসে ব'লে উঠলো অরুণা।

'সেই তো আশ্চর্য ! কী জাদু আছে তোমার হাতে, তোমার চোখে, তোমার কথায়—তা-কি তুমি নিজেই জানো ! তোমার ঐ হাত যেন যুদ্ধের নিশান—তার ডাকে আমি যা পারি, তা-কি পারি আর কিছুর জন্য।

অরুণা কিছু বললে না, এমনভাবে তাকিয়ে রইলো যেন পলক পড়ে না। আর অশোক বলতে লাগলো, 'পৃথিবীর ইতিহাসে চিরকাল এই অসম্ভবকে সম্ভব করিয়েছো তোমরাই—তোমরা মেয়েরা। দুঃসাহসের রাস্তা খুলে দিয়েছো তোমরাই তো। পুরুষ তোমাদেরই হাতের সৃষ্টি—তোমাদেরই বাঁকা চোখের স্বপ্নের আকাশে পুরুষ নির্মাণ করেছে তার কীর্তির রূপকথা। তোমরাই ঘরছাড়া করেছো পুরুষকে, এগিয়ে দিয়েছো কালো চুলের ঠেলা

দিয়ে সর্বনাশের পথে।'

ধ্বক্ ক'রে উঠলো অরুণার বুকের মধ্যে। কাঁপা গলায় বললে, 'না-না, অমন কথা বোলো না।'

অশোক ক্ষীণ হেসে কপালের উপর থেকে চুলের গোছা সরিয়ে দিলে - 'পাগল! আমাকে নিয়ে কোনো ভয় নেই তোমার। সে আলাদা জাতের মানুষ—যারা সর্বস্ব পণ করে অনায়াসে, মরতে-মরতেও যাদের জেদ মরে না। অরুণা, তাদের হার হয়, তারা মরে—কিন্তু তাদের হাজার হারের উপরে মানবজাতির শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠা, ইতিহাসে এ-ই তো দেখে এলাম। তোমার ভয় নেই—তোমার এই অশোক সেন, সে-জাতের মানুষ নয়। সে বীর নয়, সে যোদ্ধা নয়, কবি নয়, অতি সাধারণ মানুষ সে। তবু ঈশ্বর তাকে আজ অপূর্ব সুযোগ দিয়েছেন তার পৌরুষ প্রমাণ করবার। সে-সুযোগ সে হারাবে না।'

শেষের কথাটা অশোক বললে ভীরু ছোটো গলায়, চুপি-চুপি।

ছায়া আরো ঘনিয়ে এলো ঘরের মধ্যে, ভালো ক'রে মুখ দেখা যায় না। অরুণা নতমুখে ব'সে রইলো স্তব্ধ হ'য়ে, তার বুকের রক্ত হাজার সমুদ্রের তোলপাড়। একটু পরে অশোক বললে খুবই সহজভাবে, 'তাহ'লে তোমার একান্ত অমতে তোমার মা-বাবাই কি কিছু হ'তে দেবেন?'

'চিঠি থেকে তো মনে হ'লো' বলতে গিয়ে গলা কেঁপে গেলো অরুণার, 'মনে হ'লো—যেন সবই প্রায় ঠিক।'

'তোমাকে একবার জিগ্যেস করবেন তো?'

'আমাকে জিগ্যেস করবার আবার দরকার কী? আমি ছেলেমানুষ—তার উপর মেয়ে—আমি কি নিজের ভালো-মন্দ কিছু বুঝি?'

'তাই বলে জোর ক'রে তো আর বিয়ে দিতে পারে না!'

'পারেন না? পারেন না?' অরুণা প্রশ্নভরা ব্যাকুল চোখ তুলে অশোকের দিকে তাকালো। 'কী হবে, কী উপায় হবে আমার?' বলতে-বলতে অরুণার দু'চোখ ছাপিয়ে জল এসে পড়লো। চোখের জল লুকোতে চাইলো না, সে তাকিয়ে রইলো অসহায় সমর্পণের ছবির মতো।

'কাঁদছো কেন?' বললে অশোক, 'কেঁদে কী হবে?'

'কেন এমন হ'লো? কেন আমার দেখা হ'লো তোমার সঙ্গে? কেন আমি নিজে থেকে ডেকে আনলাম নিজের সর্বনাশ? এখন আমার কী উপায়

হবে, এখন কী উপায় হবে আমার ?'—বলে অরুণা দু'-হাত মোচড়াতে লাগলো, যেন শরীরের যন্ত্রণায়, আর তপ্ত দ্রুত অশ্রুস্রোত নেমে এলো তার গালের উপর দিয়ে।

আর অশোকের মনে হ'লো যেন নিশান লাফিয়ে উঠেছে আকাশে, বাতাসে ভেসে এসেছে ডাক, আর দেরী নেই। আর অরুণার অশ্রুস্রোত মুহূর্তে একটা রূপালী তলোয়ার হ'য়ে উঠে তাকে মারলে।

'কেঁদো না,' একটা অসহ্য ব্যথার ভিতর থেকে সে ব'লে উঠলো, 'চলো তোমাকে কালই বিয়ে করি।'

দু'হাতে মুখ ঢেকে তীব্র ভঙ্গিতে মাথা ঝেঁকে উঠলো অরুণা, 'না-না, তুমি যাও, এখনই যাও তুমি—এখানেই শেষ হোক।'

'শেষের কথা কী বলছো, এই তো আরম্ভ হ'লো। পারবে না তুমি স্পষ্ট ক'রে তোমার মা-বাবাকে বলতে—পারবে না ?'

অরুণা'র সমস্ত শরীর থরথর ক'রে একবার কেঁপে উঠলো, যেন জ্বরের ঘোরে ব'লে উঠলো কান্নায় ভাঙা গলায়, 'তোমার যে জাত আলাদা !'

'তা জানি। তবু তো এতে সন্দেহ নেই যে, তোমাকে-আমাকে মিলতে হবে। তোমার বয়স আঠারো হয়েছে তো ?'

'কেন, এ-কথা জিগ্যেস করছো কেন ?'

'যা ভয় করছো তা-ই যদি হয়, যদি আর উপায় না-ই থাকে···তাহলে শেষ উপায় যা আছে তা-ই করতে হবে।'

'কী সেটা ?'

'পালিয়ে যেতে হবে,' আশ্চর্য লঘুতার ঢঙে অশোক বললো।

'পালিয়ে !' সঙ্গে-সঙ্গে বংশানুক্রমিক অনতিক্রম্য সংস্কারের ধাক্কায় নীল হ'য়ে গেলো অরুণার মুখ।

'শেষ উপায় সেটাই তো ! তারপর রেজিস্ট্রি ক'রে বিয়ে হবে।'

'তারপর ?'

'তারপর···অ্যাণ্ড দে লীভ্‌ড হ্যাপিলি এভার আফটারওয়ার্ডস। রূপ-কথার সব শেষের পাতা।'

'আর আমাকে কী ছাড়তে হবে এই বাড়ি—বাবা-মা ভাই-বোন—এই সমস্ত কিছু, জন্ম থেকে যাদের সঙ্গে আমি জড়িত—ছাড়তে হবে এই সব ?

'ছাড়তে হবে, সব ছাড়তে হবে—যদি দরকার হয়।'

'আর তুমি—তোমার কী দশা হবে? এর পিছনে আসবে দুঃখ, আসবে অভাব···সে-যে কত ভয়ানক, তা-কি তুমি বুঝতে পারছো?'

অশোক ম্লান হাসলো, 'আমি ও সব আগেই ভেবে দেখেছি।'

'সব কি ভেবেছো? মানুষের মুখ হাঙরের মতো হাঁ করে তোমাকে গিলতে আসবে, তা-কি ভেবেছো? হয়তো খাওয়া জুটবে না, হয়তো আদালত পর্যন্ত গড়াবে—তা ভেবেছো?'

'সব ভেবেছি। আমার নিজের মনে আমি নিসংশয়েই জানি, তুমি তোমার মন জানে কিনা, সেটাই এখন কথা।'

'আমি! আমি···কী? এই তো আমি তোমার জীবন ছারখার ক'রে দিতে চলেছি—এমন সুন্দর জীবন তোমার। এত বড়ো দুর্ভাগা আমি, তোমার স্বচ্ছন্দ শান্তির জীবনে আগুন ধরিয়ে দিলাম। তারপর দুঃখ যখন অসহ্য হবে, আমাকেই কি তুমি ঘৃণা করতে আরম্ভ করবে না? তখন আমি মরবো কেমন ক'রে?'

'হায় রে, কেবল আমার দুঃখের কথাই বলছো কেন? যতই ভয়াবহ হোক, সে-দুঃখ তো তোমারও! তুমি কি দুঃখ দেখে আমাকে ঘৃণা করবে? পৃথিবীর এমন কি কোনো দুঃখ আছে, যা তুমি-আমি একসঙ্গে সইতে পারবো না? আর কিছু ভেবো না, আর কিছু বোলো না। এই শুধু মনে-মনে বলো যে, তোমাকে আমাকে পরস্পরের কাছ থেকে কেউ যেন কেড়ে নিতে না পারে। সেটা দুঃখের কারণ হবে না, সেটা হবে ধ্বংস।'

'হয় তোমাকে দুঃখ দেবো, নয় তোমাকে ধ্বংস করবো—এই আমার কপালে ছিলো।' অরুণার কথায় আবার হতাশা।

'আমার জন্যই তোমার এত করুণা'—উচ্চেস্বরে ব'লে উঠলো অশোক, 'যেন এতে তোমার নিজের কিছু নেই। দুঃখ পেতে হ'লে তুমিও পাবে, ধ্বংস হ'তে হ'লে তুমিও হবে। আমি তো তোমার কথা ভেবে দীর্ঘশ্বাস ফেলিও না একবারও। দুঃখ তুমি যেন না পাও, এমন মূঢ় প্রার্থনাও করি না কখনো। অরুণা, এই পৃথিবীতে দুঃখের হাত থেকে আমরা কে কাকে বাঁচাতে পারি। আমি তোমাকে বলছি, অরুণা, আমার সঙ্গে দুঃখ পাবে তুমি, হাজার দুঃখ পাবে, কিন্তু সেই সঙ্গে পাবে জীবনের পরিপূর্ণতা।

'কী বলছো তুমি! আমার সুখ-দুঃখের কথা আমি কি কখনো ভাবি? তুমি কি মনে করো আমি সুখের কাঙাল?' কিন্তু, হঠাৎ অদ্ভুত নিবিড় স্বরে অরুণা বলে উঠলো, 'বাবা কী মনে করবেন, মা কি ভাববেন আমাকে! কত কাঁদবেন মা···কী ভীষণ লাগবে তাঁদের মনে!'

'এই তো!' অশোক এতক্ষণ ব'সে ছিলো, হঠাৎ সোজা হয়ে উঠে দাঁড়ালো। 'এই তো, এবার বেরিয়ে এলো আসল মানুষ, আসল অরুণা রায়। দেখা গেলো, তার মনে সংস্কারের সাপ এতক্ষণ বিঁড়ে পাকিয়ে লুকিয়ে ছিলো, এইবার গা মোড়ামুড়ি দিয়ে ফুঁশে উঠেছে।

'পায়ে পড়ি তোমার, অমন নিষ্ঠুরের মতো বোলো না। তুমিই বলো, মা-বাবাকে পায়ের নীচে মাড়িয়ে যাওয়া কি সোজা!'

'আমাকে জিগ্যেস করো না, মা-বাবার বিষয়ে কিছু জানি না আমি। তবে এটা তুমি ভুলে যাচ্ছো কেন, যে এ-দুর্ঘটনা নিবারণ করা তোমার মা-বাবার হাতের মধ্যে আছে। আমরাও তো তা-ই চাই, আমরাও চাই যে সবই সহজ হোক। যদি তাঁরা তা না হ'তে দেন, তাহ'লে বাধ্য হ'য়েই আমাদের বাঁকা পথ নিতে হবে। সে জন্য দায়ী হবেন তাঁরাই। তুমি যে পায়ের নীচে মাড়িয়ে যাওয়ার কথা বললে, সে-তো তাঁরাই ডেকে আনবেন নিজেদের উপর।'

দীর্ঘশ্বাস পড়লো অরুণার। 'কেন হয় এ-রকম, কেন হয়? কেন হয় ইচ্ছার সঙ্গে ইচ্ছার দ্বন্দ্ব?'

অশোক রাস্তার দিকের জানলার কাছে গিয়ে বাইরে তাকালো একবার ফিরে এসে অরুণার মুখোমুখি দাঁড়ালো।

'সুন্দর বলেছো কথাটা। এখন আমি তোমাকে খুব সহজ একটা প্রশ্ন করবো, ভালো ক'রে ভেবে উত্তর দিয়ো। তুমি কি আমাকেই চাও, না তোমার মা-বাবাকে?'

অরুণা বড়ো-বড়ো চোখে তাকিয়ে রইলো মূঢ়ের মতো।

অশোকের মুখের ম্লান নিবিড় একটি পেশীও কুঞ্চিত হ'লো না। স্পষ্ট উচ্চারণ ক'রে বললে 'বলো, এখন সময় হয়েছে মনস্থির করবার। তুমি কি আমাকেই চাও, না তোমার মা-বাবাকে?'

'তোমাকে—তোমাকেই চাই', সম্মোহিতের মতো বললো অরুণা।'

সঙ্গে-সঙ্গে অশোকের মুখের ভাব শিথিল হ'লো। মুখ নীচু ক'রে বললে, 'তাহ'লে তোমার মা'কে বলি, না-কি তুমিই আগে বলবে?'

'আমিই বলবো', অরুণা শান্তভাবে বললে। আর তার দিকে তাকিয়ে অশোক হঠাৎ আবিষ্কার করলে যে কখন অজান্তে রূপান্তরিত হ'য়ে গেছে সে —দ্বিধায় দ্বিখণ্ডিত বালিকা হ'য়ে উঠেছে সম্পূর্ণ আত্মনির্ভর নারী। আশ্চর্য লাগলো তার মনে-মনে। মনে হ'লো এই সে অরুণাকে প্রথম জানলো। অশোক বসলো তার পাশে, হাতখানা তুলে নিলো নিজের হাতের মধ্যে। বললে —'তুমিই বলবে?'

অরুণা হাত ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা না ক'রে বললে, 'আমিই বলবো।'

'হয়তো সহজেই হ'যে যাবে', বললে অশোক।

'হয়তো', প্রতিধ্বনি করলে অরুণা।

'তাঁরা তো তোমার বিয়ে দিতেই ব্যস্ত, আর এ-রকম বিয়ে তো কত হচ্ছে আজকাল!'

'তা, তো হচ্ছেই।'

'আর যদি এমন হয় যে তাঁরা ··বিমুখ হলেন, তাহ'লে ··খুব কষ্ট হবে তোমার এই সমস্ত ··ছাড়তে, ছেড়ে যেতে?'

'কষ্ট হবে না।' অরুণা তার সরল উজ্জ্বল চোখ তুলে ধরলো অশোকের দিকে। আর চোখের দিকে তাকিয়ে অশোকের হৃৎপিণ্ড ব্যাথায় মুচড়িয়ে উঠলো, সব কথা গেলো হারিয়ে।

'তুমি কিছু ভেবো না, অরুণা আস্তে অশোকের হাতে একটু চাপ দিলে। আমি মেয়ে, তোমাকে আমি কথা দিয়েছি, তুমি ছাড়া আমার কেউ নেই।'

তারপর দু'জনেই ব'সে রইলো চুপচাপ, হাতে হাত রেখে। অন্ধকার ঘরের মধ্যে নিঃশব্দ হাওয়ার ঢেউয়ের ওঠা-পড়া। এমন সময় হঠাৎ পাতলা স্যাণ্ডেল পায়ে সুমন্ত্র সে-ঘরে ঢুকলো, ঢুকেই থমকে দাঁড়ালো। দরজার কাছে।

এক মুহূর্তের নিবিড় স্তব্ধতা, তারপর অশোক উঠে সুইচ টিপলো। হঠাৎ তীব্র আলোর ধাক্কায় অরুণা চোখ ঢাকলো দু'হাতে।

সুমন্ত্র ঈষৎ হেসে বললে, 'দুঃখিত। তোর কাছে টুর্গেনিভের একটা গল্পের বই দেখেছিলাম অরুণা, তা-ই নিতে এসেছিলাম।'

অশোক বললে, 'বই এখন থাক। চলো, সুমন্ত্র তোমার ঘরে। কথা আছে।

* * *

সেদিন রবিবার। সকালবেলায় চায়ের পরে অরুণা তার দোতলার ঘরে গিয়ে একটা সেলাই নিয়ে বসেছিলো। সেলাইটা উপলক্ষ্য মাত্র ; একেবারে খালি হাতে চুপচাপ ব'সে থাকলে ভালো লাগে না। আসল উদ্দেশ্য একা থাকা, নির্জনে থাকা, চুপ ক'রে ব'সে থাকা। অশোকের সঙ্গে তার ও-সব কথাবার্তা হয়েছে আজ পাঁচদিন হ'লো। এর মধ্যে অশোক বার দুই এসেছে, কিন্তু অরুণার সঙ্গে একা দেখা হয়নি। অরুণাই এড়িয়ে গেছে। আর কিছু নেই। আর-কিছু বলবার নেই। এ-ক'দিনে অরুণা যেন নিজের গভীরতম সত্তাকে খুঁজে পেয়েছে ; বাইরে থেকে নিজের সত্তাটা গুটিয়ে এনে বাসা নিয়েছে নিজের মধ্যে। এ-ক'দিন সে কাটিয়েছে খুব বেশি একা, কারো সঙ্গে বড়ো-একটা কথা বলেনি। পালিয়ে এসেছে অলক্ষিতে পারিবারিক সঙ্গ থেকে। নানা কাজ ও নানা কথা নিয়ে ব্যস্ত হৃষীকেশবাবু কি বিজয়া কিছু লক্ষ্য করেন নি। লক্ষ্য করেছে সুমন্ত্র, আর অরুণা টের পেয়েছে যে সুমন্ত্র লক্ষ্য করেছে। দাদার সঙ্গে দেখা হ'লে সে চোখ নামিয়ে নেয়নি, চোখ তুলে সোজা তাকিয়েছে, তারপর শান্তভাবে চ'লে গেছে অন্যদিকে।

সে শুধু চেয়েছে একা থাকতে, চেয়েছে একা ব'সে চুপ ক'রে ভাবতে। এ-ক'দিন সে কেবল ভেবেছে দিনে-রাত্রে, আর-কিছু করেনি। কী ভেবেছে ? সে জানে না চলতে-চলতে যেন তার পথের সামনে জ্ব'লে উঠেছে পুঞ্জ পুঞ্জ আগুন, নেমে এসেছে আকাশ-জোড়া মেঘ, যেন লাল আগুনের মেঘ তাকে জড়িয়ে ধরেছে চারদিক থেকে, সারা পৃথিবীকে আড়াল ক'রে দিয়ে। চাপা প'ড়ে গেছে যে, এই বৃহৎ বাস্তবের জগৎ থেকে সে আজ লুকোনো। তার মনের সুড়ঙ্গ-অন্ধকার দিনরাত চলেছে চাপা গুমরোনি, যেন অনেক দূরের আকাশ থেকে মেঘের আওয়াজ- কথা ক'য়ে উঠছে। খেতে ব'সে সে খায় কি, না খায়, রাত্রে ঘুমোতে পারে না, রাত্রে শুয়ে-শুয়ে কাঁদে। ক'-দিনে রীতিমতো খারাপ হ'য়ে গেলো তার চেহারা। এবং এটা নিশ্চয়ই বিজয়ার

চোখে পড়তো, যদি-না তারই বিয়ের কথাবার্তায় তাঁর মনটা অস্বাভাবিক রকম ব্যাপৃত থাকতো।

সেদিন সকালে সে জানলা দিয়ে দেখলো, একটা কৃষ্ণচূড়া গাছের থোকা-থোকা ফুলের লাল মেঘ আকাশকে লেপে দিয়েছে। আর হঠাৎ তার মনটা ব্যাথিয়ে উঠলো। অস্বাভাবিক, তীক্ষ্ণ একটা ব্যথা। এ যেন আর সে সইতে পারছে না এই অবরোধ গোপন সুড়ঙ্গের এই গুমরোনি—ভাঙুক দরজা, ঝড় উঠুক—আসুক আকাশ বাতাসের উদ্দাম নৃত্য তার বুকের মধ্যে। সেই বিশাল ভয়াবহ মুক্তির মধ্যে সে হাঁফ ছেড়ে বাঁচবে।

মনটাকে শান্ত করার চেষ্টায় সে চোখ নীচু ক'রে সেলাইয়ে ফোঁড় তুলতে যাবে, এমন সময় হুড়দাড় ক'রে পিণ্টু ঢুকলো সে-ঘরে! হাতে তার লুডো খেলার সরঞ্জাম। অরুণা'র কাঁধের উপর অকারণেই একটা চড় মেরে বললে —'দিদি, এসো লুডো খেলি।'

তারপর দিদির সম্মতির অপেক্ষা না-ক'রেই লুডোর ছক পেতে ব'সে মেঝেতে আসনপিঁড়ি হলো। কাঠের চোঙার মধ্যে ঘুঁটিটা সশব্দে নাড়তে নাড়তে বললে, 'এসো, এসো শিগগির।'

ছেলেটার জ্বলজ্বলে মুখের দিকে তাকিয়ে অরুণার বড়ো মায়া হ'লো। আস্তে বললে, পিণ্টু, 'তুই কেন এত লুডো খেলতে ভালোবাসিস!'

'ওঃ, এসো-এসো, ছাখো তোমাকে কেমন হারিয়ে দিই দশ মিনিটে। আমার কিন্তু লাল।'

'আমার সঙ্গে খেলে তোর তো ভালো লাগবে না—আমি তো আগে থেকেই হেরে আছি।'

নিজের হাঁটুতে চড় মেরে চীৎকার ক'রে উঠলো পিণ্টু, 'খেলবে কিনা তা-ই বলো!'

অরুণা উঠে গিয়ে টান দিলে তার টেবিলের ছোটো দেরাজে। চুলের কাঁটা-ফিতে, বন্ধুকে লেখা অসমাপ্ত চিঠি, চকোলেটের মোড়ক ইত্যাদির মাঝখানে কপালগুণে একটি-সিকি পাওয়া গেলো। সেটি হাতের তেলোয় রেখে পিণ্টুর সামনে হাত মেলে ধ'রে বললে 'এই নে।'

পিণ্টু তাকালো সেই লোভনীয় মুদ্রার দিকে, তারপর তাকালো দিদির মুখে, এই আশাতীত বদান্যতার পিছনে কোনো গোপন অভিসন্ধি আছে

কিনা, বোধহয় তা-ই আঁচ করতে।

অরুণা বললে, 'নে এটা, তারপর ভাগ, একেবারে এক ছুটে পল্টুদের বাড়িতে। পল্টুকে যদি হারাতে পারিস, তবে বুঝব।'

'ইস্, পল্টুকে কতদিন হারিয়েছি না, জিগ্যেস ক'রে দেখো। তা ওর সঙ্গে আমি তো আর খেলবো না।'

'ওর সঙ্গে ঝগড়া করেছিস?'

'করেছি, বেশ করেছি। ও একটা ইষ্টুপিট, ফুল—দেখতে পারিনে ওকে দু'চক্ষে।'

'এই তো সেদিন কত ভাব দেখলুম।'

'তুমি তাহ'লে খেলবে না আমার সঙ্গে?' গজরাতে-গজরাতে পিণ্টু বললে, 'খেলবে না-তো?'

পিণ্টু, শোন—,

অরুণা হাত বাড়িয়ে তাকে ধরতে যাচ্ছিলো, পিণ্টু একলাফে স'রে গেলো। 'যাও, যাও—ভেবেছো কী তুমি, আমি একাই বেশ খেলতে পারবো—যাও!' বলতে-বলতে, ফুঁসতে-ফুঁসতে ছিট্‌কে বেরিয়ে গেলো বারান্দায়। পরমুহূর্তেই ফিরে এসে বললো, কই পয়সা দেবো ব'লে তারপর বুঝি আর দিতে হয় না!'

অরুণা একটু হেসে বললে, 'নিলেই তো হয়।'

ছোঁ মেরে সিকিটা তুলে নিয়ে পিণ্টু বারান্দায় গিয়ে পা ছড়িয়ে ব'সে পড়লো মেঝেতে; লুডোর ঘর পেতে খেলতে ব'সে গেলো মনে মনে শত্রুপক্ষ সাজিয়ে। টুনকি এসে খবর দিলে, 'দিদি, মা তোমাকে নীচে ডাকছেন।'

নীচে যেতে একটুও ইচ্ছা করছিলো না অরুণার। জিগ্যেস করলে, 'কেন রে?'

টুনকি ঘাড়ের কাছে চুল ছড়িয়ে বললে, 'তা-তো জানি না।'

'কেউ এসেছে নীচে?'

'কাপড়ের ফেরিওয়ালা এসেছে।'

ও, তাই। কোনো শাড়ী কি ব্লাউজপীস পছন্দ করতেই মা তাকে ডাকছেন বোধহয়। আজকাল তার কাপড় চোপড়ের প্রয়োজন সম্বন্ধে মা বড়ো বেশি সচেতন। প্রয়োজন—কিন্তু পঞ্চাশটা জামা আর চৌত্রিশটা

শাড়িতে কি মানুষের প্রয়োজন মেটে? তবু মা ফেরিওয়ালা দেখলেই আর ছাড়েন না—অরুণাকে ডেকে এটা নিবি, ওটা নিবি ব'লে পীড়াপীড়ি করেন, অরুণা চুপ ক'রেই থাকে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত কিছু না কিছু রাখাই হয়। একবার বছরখানেক আগে অরুণা যখন কুড়ি টাকা দামের একখানা নীল রঙের ময়নামতী শাড়ী কিনতে চেয়েছিলো, এই মা-ই বলেছিলে, চাইতে শিখলে কবে? তোমাদের যা দরকার, তা তো না চাইতেই পাও।'

সেদিন অরুণা যে লজ্জা পেয়েছিলো, তার তুলনা হয় না। ঘোরতর লজ্জা এই কারণে যে, সত্যি সে মুখ ফুটে কখনো কিছু চায় না, হঠাৎ একটা খুশীর ঝোঁকে সেই একবার চেয়েছিলো। এবং মা'র কথায় তার যে আত্মশুদ্ধি হয়েছিলো, তার জন্যে সে কৃতজ্ঞই বোধ করেছে মনে মনে। কিছু চাইতে হয় না—এ-কথা জীবনে সেও ভুলবে না। আর সেই মা আজ তাকে নানা রঙের নানা রকমের জামাকাপড় কেনার জন্য প্রতিদিন পীড়াপীড়ি করেন। ব্যাপারটা সে বুঝতে পারে অবশ্যি। এ তার বিয়ের আয়োজন। নয়তো তাদের অবস্থা হঠাৎ এমন কিছু ফেঁপে ওঠেনি যে, যত খুশী, যেমন খুশী জামা-কাপড় তার জন্য মঞ্জুর হ'তে পারে। বরং সে যতদূর জানে; বাবার অবস্থা এখন পড়তিরই দিকে। এবং তার বিয়ে সম্বন্ধে এত ব্যাকুলতাও সেইজন্যেই।

কাপড়ওলা এসেছে—তাকে নীচে যেতে হবে। হঠাৎ একটা বিতৃষ্ণায় তার শরীর সংকুচিত হ'য়ে উঠলো। সেই অনুভূতি যেন শারীরিক ন্যাকারের মতো। টুনকি আবার বললে, 'কই' যাচ্ছো না?'

অরুণা কিছু বললে না; কথাটা বোধহয় তার কানেও যায় নি।

টুনকি হঠাৎ অরুণার গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে চুপিচুপি বললে, 'দিদি, তোমার কি বিয়ে?'

এই কথাটা শুনে টুকটুকে লাল হ'য়ে উঠলো অরুণার মুখ। রাগে বোনের দিকে তাকিয়ে বলল, 'টুনকি!'

ভয়ে জড়োসড় হ'য়ে টুনকি দাঁড়িয়ে রইলো চুপ করে।

'সারাদিন ঘুরে ঘুরে বড়োদের কথা গিলিস—আর নিজের মাথাটি 'চিবিয়ে খাস, না?'

টুনকি প্রায় কাঁদো কাঁদো হ'য়ে গিয়ে বললে, 'আমি কী বলেছি, আমি তো শুধু—' টুনকির গলা আটকে এলো।

'এ সব কথা কক্ষনো আর বলবি না।'

'না, আর বলবো না।'

টুনকি মাথা ঝাঁকালো, দুলে উঠলে তার ঝাঁকড়া কালো এলোমেলো চুল। অরুণা দেখলো, মেয়েটা বুঝি কেঁদেই ফেলবে। তাড়াতাড়ি ওর কালো কুচ্‌কুচে মাথাটা টেনে নিলো বুকের কাছে। ঝরঝর ক'রে কেঁদে ফেললো টুনকি। ওর চুলে হাত বুলোতে-বুলোতে অরুণা বললে, 'কেন বললি? জানিসনে, বড়োদের কথা ছোটদের বলতে নাই।'

দু'হাতে চোখ চেপে ধ'রে টুনকি আরো একটু কাঁদলো, তারপর হাত সরিয়ে নিয়ে চকচকে চোখে তাকালো দিদির মুখের দিকে। কান্না থেমেছে, লেগে রয়েছে চোখের কোণে কালো-কালো দাগ।

আর ঐ মেয়েটার মুখের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ কেমন ক'রে উঠলো অরুণার বুকের ভিতরটা। এ-বাড়ির মধ্যে এই ছোটো মেয়েটাই কেমন যেন আলাদা, যেন অন্য রকম। বেশীর ভাগ সে থাকে একা, নিজের মনে; অন্যদের কাছে যখন ঘেঁষে, এমন একটি কুণ্ঠা নিয়ে দূরে দাঁড়িয়ে থাকে চুপ ক'রে শিশুর পক্ষে যেটা স্বাভাবিক নয় একেবারেই। সে যেন সকলের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে, তাকে কেউ কিছু বলবে এই আশায়। কিন্তু বিশেষ-কিছু কেউ বলে না, তাকে আমলেই আনে না কেউ, সে নিতান্ত ছেলেমানুষ বলে। শুধু বাবা মাঝে-মাঝে কাছে ডাকেন, তখন তার জীবন যেন ধন্য হ'য়ে যায়। একটু লক্ষ্য করলে বোঝা যায়, তার শিশুমনের সমস্ত পূজা সে দিয়েছে তার বাবাকেই; তার বাবা মানুষের মধ্যে শ্রেষ্ঠ তার অস্পষ্ট কল্পনার ঈশ্বরের মতো। তাদের পরিবারে শিশুদের সামনে নানা বিষয়ে আলোচনার বাধা নেই—টুনকি হয়তো নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে সব শোনে। কিছু কি বোঝে? কিছু কি বোঝে না। শিশুদের যতটা ছেলেমানুষ, আমরা মনে করি, ততটা ছেলেমানুষ তারা হয়তো নয়। আর্থিক টানাটানির সঙ্গে সঙ্গে পরিবারে নানা রকম দ্বন্দ্ব ও সংঘাত দেখা দেয়. এই মেয়েটার মনে হয়তো আছে সে-সমস্তরই অনুভূতি। গোপন মনে-মনে সবই হয়তো সে বোঝে—বাবার অভাব, দাদার অমিতব্যায়িতা, দিদির বিয়ের সমস্যা। আর তাই—তার মুখের ভাবটাই একটু অন্য রকম। সে যে সব বোঝে, সেটা তাকে গোপন করতে হচ্ছে সব সময়—সেইজন্যই কি তার অমন কুণ্ঠা?

মেয়েরা কি কিছুটা এই রকমেই হয়? পিণ্টু তো ওর চেয়ে তিন বছরের বড়ো কিন্তু ও মেতে আছে ওর লুডো-ক্যারাম-সিনেমার শিশুস্বর্গে, ওর আবদারে, আবদারে, অত্যাচারে সবাই অতিষ্ঠ। যত অসংখ্য বিচিত্র প্রয়োজন তার জীবনের, কোনো রহস্যময় ভাণ্ডার থেকে তার অফুরন্ত জোগান আসবেই, এই অন্ধ বিশ্বাসে সে নিশ্চিন্ত ও নির্ভীক। ক্ষেপে ওঠে সে, সেই বিশ্বাসে এতটুকু ঘা লাগলে। বাড়ির সঙ্গে তার শুধু সেই রসদ-জোগানের সম্পর্ক, তার জীবনটা তো বাইরের বহুল বিচিত্রতায় ছড়ানো-ছিটোনো। ও-রকম কি হ'তে পারে মেয়েরা? মেয়েরা কিছু আলাদাই হয়—নিজেকে দিয়েই সে তা বুঝতে পারে। শিশুকাল থেকে মেয়েরা থাকে ঘরে, ঘরের মধ্যেই তাদের সব খেলা আর খেয়াল; সব তারা শোনে, সব তারা ছাখে, কিছু কিছু হয়তো বোঝে। এই নির্জন মুহূর্তের সুযোগ নিয়ে টুনকি নিশ্চয়ই চেয়েছিলো কোনো মনের কথা বলতে—নয়তো কোনো অসংগত কি উদ্ধত মন্তব্য করবার মতো। মেয়ে তো সে নয়।

'কোথায় শুনলি রে, আমার যে বিয়ে হবে?' অরুণা বললে টুনকির জলে ভরা চক্‌চকে চোখের দিকে তাকিয়ে।

টুনকি জবাব দিলে না। লজ্জা সে এমনিতেই খুব পেয়েছে, আর অপমান ক'রে কাজ নেই, এমনি তার মুখের ভাব।

'বল, কোথায় শুনলি।' অরুণা হাসলো, টুনকি যাতে সাহস পায়।

'সবাই—বলছে, ক্ষীণ, অস্পষ্ট গলায় বললে টুনকি।

'সবাই বলছে—না?'

অরুণা আর কিছু বললে না—নাকি। আর কিছু বলতে গিয়ে থেমে গেলো? কী বলবে সে এই শিশু মেয়েকে—আর এই মেয়েই বা কী বলবে তার কথা উঠলে···এর পরে···আরো?

'হঠাৎ যেন ভিতরকার কোনো অপ্রতিরোধ্য চাপে টুনকি ব'লে উঠলো তারপর তুমি তো আমাদের ছেড়ে চ'লে যাবে—না, দিদি?'

আর অরুণা নিজেও টের পেলো না কখন তার দু'-চোখ জলে ভ'রে উঠলো। বুকের মধ্যে একটা অস্পষ্ট, একটানা ব্যথা, হৃৎপিণ্ডটা মুচড়ে উঠছে যেন। টুনকির দিকে না তাকিয়ে সে উঠে গেলো, দাঁড়ালো জানলার ধারে গিয়ে, যেখানে কয়েকটা জলজল করছে রোদ্দুরে। নামলো কান্না।

'অরুণা, কোথায় রে—' বলতে-বলতে বিজয়া ঘরে ঢুকলেন। হাতে তাঁর দু'-খানা জর্জেটের শাড়ি, ভাবটা কিছু ব্যস্ত। আবার ডাকলেন 'অরুণা, আয় এদিকে, শোন।'

মা-র ডাক শোনামাত্র অরুণার কান্না নিজে থেকেই থেমে গেলো, যেন ভিতরকার কোনো যন্ত্রের কৌশলে; বাইরের দিকে তাকিয়ে অলক্ষিতে চোখ মুছে নিয়ে সে কাছে এলো।

'সেই ফেরিওয়ালা এসেছে—কী সুন্দর জর্জেট এনেছে, ছাখ্।'

অরুণা চুপ। বিজয়া বললেন—'সেই কখন থেকে ডাকছি তোকে। দ্যাখ্, এ দু'টো আমি পছন্দ ক'রে আনলাম, এর মধ্যে কোনটা রাখবি বল।'

'যেটা হয় রাখো' অরুণা বললো ধরা গলায়।

শাড়ীর শোভা দেখতে বিজয়া এত ব্যস্ত ছিলেন যে মেয়ের মুখের দিকেও ভালো ক'রে তাকালেন না। কাপড় নিয়ে নাড়াচাড়া করতে করতেই বললেন, 'এই গোলাপী রঙেরটায় তোকে বেশ মানাবে—তাছাড়া, এ-রঙের শাড়ী তোর একটাও নেই।'

'বেশ এটাই রাখো।'

'না কি ব্লু রঙেরটা রাখবি? সেদিন অনাদিবাবুর মেয়ে এই রঙের শাড়ি প'রে এসেছিলো না? জরির চুমকিগুলো ঝলমল করে রাত্রে। গোলাপী রংটায় ওগুলা বেশী খোলে না কিন্তু।'

অরুণা কিছু বলবার চেষ্টা করলো। কিন্তু কিছু খুঁজে পেলো না।

দু'হাতে দু'টো শাড়ী নাড়াচাড়া করতে করতে বিজয়া বললেন, 'কাপড় দু'টো বেশ কিন্তু—দ্যাখ্। আর, যদিও কাপড়ওয়ালার কথাটা শুনে ফেলবার সুদূরতম সম্ভাবনাও ছিলো না, তবু তিনি গলা নামিয়ে অন্তরঙ্গ সুরে বললেন, 'আর কী সস্তা, পঞ্চাশ টাকা চেয়েছিলো, চল্লিশে রাজি করিয়েছি। এ-কাপড়ই দোকানে ঝুলিয়ে রাখলে ষাট টাকা।

কিন্তু অরুণা কাপড়গুলো ছুঁয়েও দেখলো না, দূর থেকে শুকনো চোখে তাকিয়ে বললে, 'জাপানী বোধহয়?'

'হোক জাপানী, জাপানী তো আর গায়ে লেখা থাকে না। দেখতে শুনতে বিলিতি জর্জেটের চেয়ে খারাপ নাকি? ফেরিওয়ালা হ'য়ে কত সুবিধেই হয়েছে। নিজেরা দেখে-শুনে রাখা যায়, আর অর্দ্ধেক সস্তা তো

পড়েই, তার উপর বাকিও রাখা যায়।'

রীতিমতো উচ্ছ্বসিত হ'য়ে উঠলেন বিজয়া। দেখে কি মনে হয় না, কাপড়-চোপড় তিনি সত্যি-সত্যি ভালোবাসেন—কিন্তু নিজের জন্য নয়, মেয়ের জন্য। নিজের সম্বন্ধে কোনো খেয়ালই নেই তাঁর। অরুণা কখনো তাঁকে দ্যাখেনি, মিলের সাদা শাড়ী ছাড়া আর কিছু পরতে। বড়ো জোর ঢাকেশ্বরী মন্দিরে কি বিশেষ কোনো নিমন্ত্রণে যাবার সময় লাল-পেড়ে গরদ। আছে তাঁর বাক্স বোঝাই হ'য়ে যৌবনের রং-খেলানো চোখ-ঝোলসানো শাড়ীর স্তূপ। সুমন্তর বৌয়ের জন্য সে-সব। সে জর্জেট নিয়ে এখন তাঁর এত উৎসাহ, অরুণা যদি প্রস্তাব করে তার একখানা তাঁর গায়ে উঠবে, তাহ'লে তিনি এত স্তম্ভিত হবেন যে, সারাদিন বোধহয় আর ভালো ক'রে কথাই বলতে পারবেন না।

'তাহ'লে এই গোলাপীখানাই রাখি—উঁ?

'রাখো।'

এক মুহূর্ত দ্বিধা ক'রে বিজয়া বললেন, 'না-কি, দু'খানাই রেখে দেবো? দাম তো পরে দিলেও চলবে।'

অরুণা হঠাৎ নিতান্ত ব্যাকুল হ'য়ে ব'লে উঠলো, 'না—না, কক্ষনো তুমি দু'খানা রাখতে পারবে না, মা। এক্ষুনি ফিরিয়ে দিয়ে এসো গে, যাও।'

বিজয়া একটু অবাক হ'য়েই মেয়ের মুখের দিকে তাকালেন। অরুণার উত্তেজনাটা একটু মাত্রা ছাড়িয়েই গিয়েছিলো—সে নিজেও লজ্জিত হ'লো। একটু শান্তভাবে বললে, 'সত্যি মা, দু'খানা রেখে কী হবে।'

'আহা—বলেছিলুম ব'লেই আমি যেন দু'খানা রাখতে গিয়েছি। তুইও যেমন!' প্রত্যাখ্যাত শাড়িখানার উপর সস্নেহে শেষবার হাত বুলিয়ে তিনি সেখানা ভাঁজ ক'রে তুলে নিলেন। একটু থেমে বললে, 'তুই স্নান করবি না?'

'করবো খ'ন—এখনই কী হয়েছে!'

'চল আজ তোর মাথা ঘ'ষে দিই। আমার হাত খালি আছে এখন—চল।'

'না—না—এখন না-মা, আজ না। আজ কিছুতেই মাথা ঘষবো না আমি।'

'লক্ষ্মী মা, চলো নিজে তো ঘষবি না কখনো, অযত্ন ক'রে ক'রে সুন্দর

চুলগুলোর কী দশাই করেছিস!'

অরুণার চুলের যে খুব দুর্দশা, তা সে এই অবশ্য প্রথম শুনলো; আর তা-ছাড়া মায়ের এই সস্নেহ সম্বোধনও আজ অদ্ভুত লাগলো তার। মাথা নেড়ে বললে' 'আজ ইচ্ছে করেছে না একেবারেই। আর এই তো সেদিন মাথা ঘষলুম, কলেজের নাটকের দিন।'

,ওঃ সে কবেকার কথা! একেবারেই বেশিই হবে।'

'হোক। মাথা আবার কেউ রোজ-রোজ ঘষে নাকি?'

'আহা—আয় না আজ তোকে স্নান করিয়ে দিই নিজের হাতে ভালো ক'রে। সেই তো ঝুপঝুপ দু'টি জল মাথায় ঢেলে কলেজে যাস, ওকে কি আর স্নান বলে! গায়ে বুঝি সাত জন্মের মাটি পড়েছে।

হঠাৎ একটা বিকট সন্দেহ লুকোনো কালো সাপের মতো লাফিয়ে উঠলো অরুণার মনে, মুহূর্তে যেন পাথর হ'য়ে গেলো তার হৃৎপিণ্ড। বিজয়ার দিকে স্থির, গভীর দৃষ্টিতে সে তাকিয়ে রইলো, কিছু বললো না। বিজয়া আবার ডাকলেন, 'চল না।'

'না, আমি এখন স্নান করবো না, তুমি যাও', বলে অরুণা গিয়ে টেবিলের ধারে তার চেয়ারে বসলো। তার কথার সুরে, তার চোখে-মুখে চলবার ধরনে এমন-কিছু ছিলো, যাতে বিজয়া আর জোর করতে পারলেন না। ঘর থেকে চ'লে যেতে-যেতে নীচু গলায় শুধু বললেন, 'বাবাঃ—তোরা যে সব কী হচ্ছিস দিন-দিন, কিছু বললেই গায়ে ফোস্কা পড়ে।'

অরুণা চুপ ক'রে ব'সে রইলো, টেবিলের উপর দু'-কনুই আর হাতের মধ্যে মাথা রেখে। তার শরীর যেন অসাড় হ'য়ে গেছে। সে জানে, সে নিশ্চিত জানে: তার সেই ভয়ানক সন্দেহই যে সত্য, তা এক মুহূর্তের বিদ্যুৎ ঝলকে কেমন ক'রে সে বুঝে ফেলেছে। কথাটা একবার যখন মনে পড়লো, তখন আরো নানারকম প্রমাণ পেতে দেরী হলো না। সকাল থেকেই বাবা-মা'র মধ্যে একটা চাপা ব্যস্ততার ভাব। তাঁরা অবশ্য রোজই ব্যস্ত, সব সময়েই ব্যস্ত; কিন্তু আজকের ব্যস্ততাটা একটু অন্য রকম, তার মধ্যে একটু যেন দুশ্চিন্তার আমেজ। চায়ের সময়ে নীচু গলায় একটু কথা দু'-জনে, এ-রকম তো ওঁরা কত সময়েই বলেন, তখন অরুণা কিছু বোঝেনি। তারপর শাড়ী কেনা হ'লো, অঙ্গমার্জনা ও কেশসাধনার জন্য পীড়াপীড়ি, তারপর···

তারপর। যে-চিঠিটা তার হাতে পড়েছিলো, তাতে তো ও-কথা স্পষ্ট লেখাই ছিলো, যদিও তারিখ উল্লেখিত ছিলো না।

অরুণা দু'-আঙুলে চোখ টিপে ধরলো। আর তার বোঁজা চোখের সামনে ফুটে উঠল এক নাটকের দৃশ্য। সাদা কথায় বলতে গেলে ব্যাপারটা এই, এক ভদ্রলোক তাকে বিবাহ করবার প্রস্তাব বিবেচনা করতে সম্মত; তিনি আজ বিকেলে সবান্ধবে তাদের বাড়িতে আসবেন, আর তাকে স্নান মার্জিত চিক্কণ দেহ নিয়ে গোলাপী রঙের জর্জেট প'রে তাঁদের কাছে গিয়ে দাঁড়াতে হবে।

কথাটা কী ক'রে সে অমন নির্লজ্জ স্পষ্টতায় ভাবতে পারলে! তখনই অবাক লাগলো তার প্রতিটি কথা কোনো পিচ্ছিল সমুদ্র-সরীসৃপ; চারদিক থেকে তাকে জড়াতে আসছে লিকলিক, কিলবিল ক'রে। পারবে না সে; ম'রে গেলেও পারবে না।

কিন্তু এই বা কেমন যে, মা-বাবা আগে তাকে কিছু বলবেন না?

যে-ঘটনা একশোতে সাতনব্বুই জন হিন্দুমেয়ের ভাগ্যেই হয়তো একাধিকবার ঘটে, এ পর্যন্ত তার জীবনে সে ঘটেনি। ভাবিনি, কখনো ঘটতে পারে। এখন তার বয়স উনিশ। সে নেহাৎ অন্ধ, কুনো হ'য়ে নেই; সে একটু লিখতে-পড়তে পারে, একটু ভাবতে পারে, পৃথিবী বৃহৎ জীবনের কল্লোল একটু তো লেগেছে তার কানে—সেই শিক্ষার ব্যবস্থা এই মা-বাবাই করেছেন। কী ক'রে তাঁরা ভাবতে পারলেন যে, তার মতো বয়সেরও পরিণত মনের মেয়েকে···একবার জিজ্ঞেস পর্যন্ত করলেন না তাঁরা! ঠিক এমনি হয়তো কত মা-বাবাই করছেন ঠিক তারই মতো কত মেয়েকে প্রতিদিন ঘরে ঘরে। কিন্তু সে ভেবেছিলো, তার মা-বাবা অন্য রকম। ভুল করেছিলো ভেবে। ও আমাদের মেয়ে ওকে, যা করতে বলবো ও তা-ই করবে। হ'তো যদি সে হাড়ে-মাংসে জড়ানো একটা বস্তা···তাহ'লে কোনো ভাবনাই ছিলো না। তাহ'লে তাঁরা অনায়াসে পারতেন সেই বস্তাকে রংদার শাড়ী পরিয়ে চুল কলিয়ে দিয়ে হাত ধ'রে বিবাহেচ্ছু পুরুষের সামনে উদ্ঘাটন করতে। কিন্তু তা-তো নয়। তার হৃদয় আছে, আছে স্বতন্ত্র অনুভূতি, তার বুদ্ধি আছে, আছে বিচারশক্তি, আছে রুচি-আশা-ইচ্ছা—এমন কি অনিচ্ছাও আছে। সে মানুষ, সে একটা স্বতন্ত্র সত্তা। এত অতি সহজ বৃহৎ কথাটা কী অনায়াসে

তার মা-বাবা ভুলে গেলেন! আশ্চর্য, তাঁরা কি অন্ধ? প্রথা-অন্ধ তাঁরা তাই এই অশ্লীল প্রথার সামনে মেয়ের চরম অপমানের তাঁরা আজ উৎসুক। স্থূলবুদ্ধি দুঃশাসন দ্রৌপদীর বস্ত্রই শুধু হরণ করতে চেয়েছিলো, তাকে পণ্যের মতো সাজিয়ে সম্ভাব্য প্রভুর সামনে জাহির করবার সূক্ষ্মতম ও দারুণতর অপমান তার মাথায় আসেনি। তবু তো শ্রীকৃষ্ণ দ্রৌপদীকে তখন বাঁচিয়েছিলেন, কিন্তু এখানে বাঁচাবে কে?

আর এ-দেশেই এককালে মেয়েরা হ'তো স্বয়ংবরা, পুরুষকে জয় করতে হ'তো স্ত্রী, নিজের বীর্যের প্রমাণ দিয়ে। তখন প্রেম মানেই ছিলো বিবাহ; প্রেমই ছিলো মিলনের হেতু ও সমর্থন। তখনকার দুর্যোধন দুঃশাসনেরাও এ-নীতিকে মর্যাদা দিয়েছে। রাবণ ডাকাত ছিলো, কিন্তু ইতর ছিলো না। সেই দেশ আজ অন্ধ মূঢ় নির্বোধ-নিষ্ঠুর, সেই দেশ মৃত প্রথাবদ্ধ ব্যাভিচারে কলুষিত। যে অবস্থায় পুরোনো নীতি ও তার সংলগ্ন প্রথা উদ্ভব হয়েছিলো, সে-অবস্থা একেবারেই বদলে গেছে; এখনকার অবস্থায় সে-সব প্রথা প্রয়োগ করাও যা, গলিত শব আকড়ে প'ড়ে থাকাও তা-ই। ন-বছরের বুদ্ধিহীন বালিকাকে কনে দেখানো সম্ভব ছিলো, অসংগতও ছিলো না, কিন্তু যে মেয়ে পূর্ণবয়স্কা, যে-মেয়ে দিনের আলোয় জগৎটাকে দেখেছে, তাকে নিয়ে ছি-ছি ছি। অরুণার মাথা থেকে পা পর্যন্ত একটা ঘৃণার ঢেউ উত্তাল হ'য়ে উঠে মিলিয়ে গেলো।

এই প্রথা-পীড়িত দেশকে কোন কৃষ্ণ ত্রাণ করবে? কিন্তু একটা বিষয়ে সে নিশ্চিত। নিজের উপর এই জবরদস্তি সে হ'তে দেবে না। পারবে না, কিছুতেই পারবে না সে।

এমনি অরুণা ব'সে রইলো, বেলা বাড়লো, বাইরে হাওয়া উঠলো তেতে, ঝাঁ-ঝাঁ রোদ আকাশে। নীচে থেকে শোনা যাচ্ছে প্রতিদিনের জীবনের শব্দ। কলতলায় ঝি কাপড় ছপ্‌ছপ্‌ ক'রে কাচছে, পিন্টু উঠোনে মার্বেল খেলছে; সাইকেল ক'রে কে এলো ক্রিং-ক্রিং। কে এলো? হঠাৎ লাফিয়ে উঠলো অরুণার হৃৎপিণ্ড। না, সে নয়, সে নয়। সে যেন আজ না আসে। কাটলো অনেকক্ষণ, কেউ এলো না তার ঘরে, বাঁচা গেলো।

বাঁচা গেলো, কেউ যেন আর না আসে তার ঘরে; কেউ যেন আজ না আসে তাকে বিরক্ত করতে। আজ সে একেবারে একা, একেবারে বিচ্ছিন্ন।

চারদিকে জীবনের জল ছলছল ব'য়ে যাচ্ছে, তাকে স্পর্শ করতে পারছে না। সে যেন চ'লে গেছে অনেক দূরে, বাড়ন্ত ঝাঁ-ঝাঁ রোদ্দুরের ঐ আকাশে ; সে আজ মূল্যহীন, ভিত্তিহীন, আসক্তি হীন, নিকট পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে সমস্ত যোগ এক মুহূর্তে তার কেমন করে ছিঁড়ে গেলো ; পালকের মতো হালকা লাগছে নিজেকে, পালকের মতো নিশ্চিন্ত স্বাধীন, এই বিশাল জলন্ত আকাশের নীচে, এই তপ্ত অবাধ হাওয়ায় একটুখানি পালকের মতো ভাসছে সে।

বেলা বাড়লো। তারপর বিজয়া এলেন। এইমাত্র রান্নাঘর থেকে বেরিয়েছেন, গায়ে ঈষৎ পেঁয়াজের গন্ধ।

'এ-কী অরুণা, এখনো তুই ব'সে আছিস ?'

'কী করবো ?'—বলে অরুণা চেয়ার ছেড়ে উঠলো না, কিন্তু মুখ ফিরিয়ে মা-র দিকে তাকালো ঋজু সংহত দৃষ্টিতে।

'কী করবো ! বাঃ বেশ মানুষ তুই। নাইতে হবে না ? খেতে হবে না ?

অরুণা কপালের উপর আস্তে হাত বুলিয়ে বললে—'শরীরটা ভালো লাগছে না মোটেও !'

'ভালো লাগছে না।' বিজয়ার কণ্ঠস্বরে এমন একটা আশঙ্কা, যা নিছক মেয়ের স্বাস্থ্যহানির জন্য নয়।

'বোধহয় জ্বর হবে।'

'জ্বর হবে ! বলিস কী ! দেখি—দেখি', বিজয়া তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে মেয়ের কপালে হাত রাখলেন। 'কই, না তো ! অত বেলা ক'রে ঘুম থেকে উঠেছিস, তাই গা-মাজম্যাজ করছে। তখন বললুম, আয় স্নান করিয়ে দিই—শুনলি না তো ! স্নান করলেই ভালো লাগতো।'

অরুণা নিজের নাড়ি টিপে বললে, 'একটু বোধহয় জ্বরই হয়েছে।'

'না-না, জ্বর না ! স্নান ক'রে খেলেই সেরে যাবে। আজ শরীর খারাপ হ'লে উপায় আছে নাকি ! আজ তোকে দেখতে আসবে যে।'

বিজয়া এত সহজে বললেন কথাটা, যেন কোনো বন্ধু বেড়াতে আসবে, কি যেতে হবে কোনো সুখকর নিমন্ত্রণে !

অরুণার মুখে এতটুকু ভাবান্তর হ'লো না। শান্তভাবে বললে, 'সত্যি অসুখ করেছে আমার। শুয়ে থাকবো এখন।'

ব'লে সে চেয়ার ছেড়ে উঠেই দাঁড়ালো, যেন এখনই শুয়ে পড়বে। বিজয়া চোখ কপালে তুলে বললেন, 'পাগল হলি নাকি তুই? আমি তোকে বলছি, কিছু হয়নি তোর। চারটের সময় ওরা আসবে—অবেলায় নেয়ে-খেয়ে চেহারাটা দাঁড়কাকের মতো ক'রে না রাখলে কি চলে না?'

অরুণা একবার গা-মোড়ামুড়ি দিয়ে বললে 'তুমি এখন যাও মা।'

মেয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে বিজয়া বুঝলেন। এ-রকম রঙ্গভঙ্গ আজ-কালকার মেয়েরা কখনো-কখনো ক'রে থাকে, তিনি শুনেছেন। এত প্রশ্রয় দিতে নেই। কঠিন গলায় বললেন, 'অরুণা, অবাধ্যতা করো না, বলছি। যাও শীগগির স্নান করে এসো—এক্ষুণি যাও।'

অরুণা বললে, 'স্নান আমি আজ করবো না।'

'ছাখো অরুণা, তোমাদের অনেক আবদার, অনেক অত্যাচার আমি স'য়ে আসছি সারা জীবন। এখন আর জ্বালিয়ো না—যাও। যা বলছি তা-ই করো।'

'কী বলছো তুমি?' উদাসীনভাবে অরুণা বললে।

'কী বলছি কানে ঢুকছে না-না? এ-রকম অসভ্যতা কোথায় শিখলি তুই? এমনিই তো সংসারের হাজার তাড়নায় আমার হাড় থেকে মাংস আলাদা হ'য়ে গেলো—তার উপর তোদের এ-রকম অলক্ষ্মীপনা কি না করলেই নয়? বলছি তোকে আজ দেখতে আসবে—তা মেয়ের কানেই ঢুকছে না।'

'কে আসবে?'

'যেই আসুক, তোর তাতে কী? আসবে—ছেলে নিজেই আসবে। কী বেহায়া বাবা তোরা আজকালকার মেয়েরা! ওরে, এখন তো কত রকমই করবি—তারপর, প্রজাপতির দয়ায় যদি হ'য়ে যায়, দু-দিন পরে তো আমাদের কথা মনেও পড়বে না।'

অরুণা একটু চুপ ক'রে রইলো, তারপর বললে, 'ওঁদের একটা খবর পাঠিয়ে দাও বরং।'

'খবর—কাদের ?'

'যাঁদের আসবার কথা। ব'লে পাঠাও, যেন আজ না আসেন।'

বজ্রাহতের মতো মেয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন বিজয়া।

'কি বললি ?'

'বললুম, ওঁরা যেন আজ না আসেন।'

বিজয়া ভালোমতো নিশ্বাস নিতে না-পেরে কয়েকবার ঢোঁক গিললেন। অরুণা আবার বললে, 'আমি ওদের সামনে যেতে পারবো না —আমার শরীর খুবই খারাপ।'

হঠাৎ কোনো গূঢ় প্রবৃত্তির পরিচালনায়, বিজয়া দ্রুত পা ফেলে একেবারে মেয়ের মুখোমুখি এসে দাঁড়ালেন, তারপর তেমনি তাড়াতাড়ি পিছনে হেঁটে আগের চেয়েও দূরে সরে গেলেন।

'এই—এই তোর মনে ছিলো। অপ্রকৃতিস্থ প্রলাপের মতো বিজয়া বলতে লাগলেন, 'ওরে হতভাগা মেয়ে, এই ছিলো তোর মনে। না— আমরা যা বলি তা তোকে করতেই হবে, বুঝলি—করতেই হবে তোকে। এ-কি ইয়ার্কি পেয়েছিস নাকি তুই ? তোর বিয়ের কথা ভেবে এদিকে আমাদের রাত্রে ঘুম হয় না—তোর বাবার চুলগুলো সাদা হ'য়ে যাচ্ছে, দেখছিস না ? আর তুই কিনা এখন বলছিস—অরুণা, আজকের দিনে কোনো গোঁয়ার্তুমি করিসনে—তুই তো এমন ছিলি না কখনো, তুই তো সুমন্ত্র নোস্—কত ঠাণ্ডা ভালো, কত বাধ্য তুই—অরু, আর অশান্তি বাড়াসনে—'

দু'-আঙুলে মাথার দু'দিক চেপে ধরে অরুণা বললে, 'পারবো না, কিছুতেই পারবো না আমি।'

বিজয়া অসহায়ের মতো ঘরের দেয়ালের দিকে, তারপর মেয়ের মুখের দিকে তারপর নিজের হাতের তলার দিকে তাকালেন। বেয়াড়া যৌবনের এই স্পর্ধা কী করে ঠেকাবেন তিনি ? অরুণা হঠাৎ অনেক বড়ো হ'য়ে হয়ে উঠলো তাঁর চোখে—সেই তাঁর কোলের মেয়ে, হাজার সুখ-দুঃখের মেয়ে —সে যেন হঠাৎ স্বতন্ত্র মস্ত ভয়ংকর একটা সত্তা হ'য়ে উঠলো, বিজয়া তাকে চেনেন না—তাকে কখনো ভাবেনি। আজ প্রথমবার তাকে দেখে

তিনি স্তম্ভিত হয়ে গেলেন।

এই ভীষণ নতুন অরুণা আবার বললে, 'তুমি যাও মা, এখন।'

এ যেন আদেশের স্বর, দু' জনের মধ্যে অরুণাই জয়ী, বিজয়ার গোপন মনে সেই চেতনা। দরজার দিকে এক পা এগোলেন তিনি, তারপর হঠাৎ থমকে গেলেন, যেন নতুন কোন ভয়ের ছায়া দেখে। হৃষীকেশবাবু দ্রুত পায়ে, ঘরে ঢুকে বললেন, 'বক্সীবাজার থেকে লোক এসেছে।'

'কী বলছে?' শুকনো গলায় বললেন বিজয়া।

'বলছে—ওঁদের চারটের সময় আসবার কথা ছিলো, তিনটের সময় আসবেন—বিকেলের দিকে আরো কি কাজ আছে।' তারপর হৃষীকেশবাবু নিজেই মন্তব্য করলেন—'হয়তো অন্য কোথাও মেয়ে দেখতেই যাবে। অন্য যে-কোনো লাইনের মতো এতেও মারাত্মক কম্পিটিশন।'

নিবিড় অদ্ভুত স্তব্ধতা নামলো ঘরে। বিজয়ার সাহস হ'লো না মেয়ের দিকে তাকাতে, সাহস হ'ল না। কেমন ক'রে তিনি পারবেন প্রচণ্ড একটা ঝড়কে মেয়ের উপর লেলিয়ে দিতে। আতঙ্কে ছোটো হ'য়ে গেলেন তিনি। কী বোকা মেয়েটা, কী বোকা! এখনো ও কিছু বলুক, এখনো বাঁচুক। নয় তো ওর বাবার রাগের অগ্ন্যুৎপাত থেকে কে ওকে বাঁচাবে, কে ওকে রক্ষা করবে তখন? নিজের অজান্তেই তিনি একটু স'রে এলেন, নিজের শরীর দিয়ে অরুণাকে আড়াল ক'রে।

কিন্তু অরুণা স'রে এসে বাবার দিকে তাকালো। আস্তে বললে, 'এ-সব কথা আমাকে তো তোমরা কিছু বলো নি।'

হৃষীকেশবাবুর মুখের চামড়া অকৃত্রিম বিস্ময়ে কুঁকড়ে গেলো—'কী বলছিস? তোকে আবার কী বলবো?'

'ব্যাপারটা যখন আমাকে নিয়েই, তখন আমাকে একটু বলতে তো পারতে!'

হৃষীকেশবাবু অন্যমনস্কভাবে বললেন, 'তুমি ছেলেমানুষ—এ-সব শোনবার দরকার কী তোমার'?

অরুণা এক মুহূর্তে চুপ ক'রে থেকে বললে, 'বাবা, তোমাকে একটা কথা বলি'।

নীল হয়ে গেলো বিজয়ার মুখ, স্নায়ুতে-স্নায়ুতে স্তব্ধ হয়ে তিনি দাঁড়িয়ে রইলেন, সেই ভয়ংকর বিস্ফোরণের প্রতীক্ষায়। এখনো হয়তো সময় আছে, এখনো হয়তো কিছু ব'লে মেয়েকে বাঁচানো যায়। বলবার চেষ্টাও করলেন —কিন্তু গলা দিয়ে আওয়াজ বেরোলো না।

হৃষীকেশবাবু মৃদু হেসে বললেন—'তুমি কিছু বলবে? বলো—তুমি কিছু ভেবো না, তোমাকে সৎপাত্রেই দেবো।'

'বাবা, যে-লোক এসেছে তাকে তুমি ব'লে দাও, ওঁরা যেন না আসেন। আমি পারবো না।'

'পারবে না? কী পারবে না তুমি?'

'ওঁদের সামনে যেতে পারবো না?'

'ওঁদের সামনে—যেতে পারবে না?' হৃষীকেশবাবু থেমে-থেমে কথাগুলোর পুনরুক্তি করলেন—যেন না বুঝে।

অরুণা আবার বললে, যেন নিজের মনে-মনে, 'পারবো না, কিছুতেই পারবো না আমি।'

হৃষীকেশবাবু একবার তাকালেন মেয়ের দিকে, একবার স্ত্রীর দিকে। দূর থেকে মেঘের গুন্‌গুন্‌ যেমন শোনা যায়, তেমনি সুরে বললেন, 'মা-মেয়েতে এই পরামর্শই তাহ'লে চলছিলো এতক্ষণ।'

অরুণা হঠাৎ তীব্র স্বরে ব'লে উঠলো, 'মাকে তুমি কিছু বলো না বাবা, মা-তো'—কিন্তু তার কথা শেষ হ'তে পারলো না, বাজ ভেঙে পড়লো একেবারে মাথার ওপর।

'অদৃষ্ট! এতক্ষণে বুঝলাম—সবই অদৃষ্টের চক্রান্ত, নয়তো সকলেই এক সঙ্গে আমার শত্রু হবে কেন? সব—সবাই একত্রে হয়ে আমার শত্রুতা করছে, আমার ছেলে, আমার মেয়ে, আমার স্ত্রী। মন্তু যেদিন আমাকে মুখের উপর ওরকম বললে, সেদিনই আমার বোঝা উচিত ছিলো! কাউকে বলিনি সে-কথা, কিন্তু আমার বুকের ভিতরটা চৌচির হ'য়ে গিয়েছিলো, ও যখন বললে আমার টাকা ও-আর চায় না। কিসের স্ত্রী-পুত্র-কন্যা, সবই টাকার খেলা সংসারে। যতদিন অজস্র টাকা দিতে পেরেছি, ছেলে আমার খুব ভালো; আর এখন অবস্থা খারাপ হ'য়েছে, তাই ছেলে আমার কী

বললেন—না, চাইনে আর তোমার টাকা! যেমন করে পারি আমাকে দিতেই হবে যে। ওর জন্মের জন্য আমিই তো দায়ী! বলে হৃষীকেশবাবু অসংলগ্নভাবে হেসে উঠলেন। তাঁর মুখে ক্রোধের আর ক্ষোভের অসংখ্য কুটিল রেখা, কথা বলতে-বলতে তাঁর দুই বলিষ্ঠ বহু মুগুরের মতো ওঠা-পড়া করতে। স্তব্ধ হ'য়ে তাকিয়ে রইলো মা-মেয়ে।

'আমিই দায়ী, আমি তো সে কথা জানতুম না, মন্ত্র আমাকে বুঝিয়ে দিয়েছে। সে-দায় কি আমি এত বছর ধ'রে বহন করিনি তিলে-তিলে পদে-পদে, প্রতি রক্তবিন্দু দিয়েও পিতার কর্তব্য থেকে আমি কি ভ্রষ্ট হয়েছি কখনো? আমার নিজের জীবনের কী সুখ, কী স্বাচ্ছন্দ্য, কী আরাম সে-কথা মনেও হয়নি কখনো! টাকা উপার্জন কম করিনি জীবনে—তোমাদের সুখের জন্যই সব ঢেলেছি, তাতেই আমার অসুখ। মিথ্যা—সব মিথ্যা। আমার বড়ো ছেলে যেদিন আমাকে অমন ক'রে বললে—সেদিনই আমার বোঝা উচিত ছিলো। ওরে, তুই তো মেয়ে, তুই তো জন্ম-পর, তোর কথা আবার আমার গায়ে লাগে নাকি? কিন্তু এটা মনে রেখো, এখনো তুমি আমারই মেয়ে, এখনো আমার কথা তুমি মানতে বাধ্য। আজ তিনটের সময় যাঁরা আসবেন, তাঁদের সামনে তোমাকে যেতেই হবে, এই আমি ব'লে দিলাম। যদি না যাও—'

হৃষীকেশবাবু দুই বাহু উদ্যত ক'রে ভয়ংকর একটা ভঙ্গি করলেন। সেটা অভিশাপের, না আঘাতের, না আত্মধিক্কারের কে বলবে। আর বিজয়া হঠাৎ পাগলের মতো ছুটে এসে কাঁপতে-কাঁপতে বললেন, 'পায়ে পড়ি তোমার, ওকে মেরো না। ওকে মেরো না তুমি—ও ছেলেমানুষ, ওর কোনো দোষ নেই।'

অরুণা দু'-হাতে তার মাকে জড়িয়ে ধ'রে এনে তার বিছানার উপর বসিয়ে দিলে। বললে, 'বাবা, আমাকে মারতে পারো, আমাকে মেরে ফেলতে পারো, কিন্তু ম'রে গেলেও আমি পারবো না।'

'তুমি পারবে না—তুমি তো পারবে না, এদিকে আমার কী দশা হবে? ভদ্রলোকেরা আসবেন—তাঁদের কাছে আমার মুখটা থাকবে কোথায়! কী বলবো আমি তাঁদের, কী ব'লে আমি মুখ দেখাবো তাঁদের কাছে—'

'সেইজন্যই তো বলেছি আগেই খবর পাঠাও। ব'লে পাঠাও আমার অসুখ করেছে।'

'তারপর? ছেলের ছুটির মেয়াদ ফুরিয়ে যাবে—তারপর?'

'তারপর কিছু নেই। এখানে তো আমার বিয়ে হবে না।'

'এখানে তোমার বিয়ে হবে না? কেন হবে না, জানতে পারি?'

'আমার ইচ্ছে নেই।'

একটা অসংবরণীয় উন্মত্ত ঝোঁকে থরথর ক'রে কেঁপে উঠলো হৃষীকেশ-বাবুর সমস্ত শরীর। দাঁতে-দাঁত ঘ'ষে ব'লে উঠলেন, 'তোমার ইচ্ছে নেই। তোমার জীবনের পরম কল্যাণের চেষ্টায় আমি প্রাণান্ত হচ্ছি—আর তাতে তোমার ইচ্ছে নেই! এখন আমার অবস্থা কী জানো না? তোমার বিয়েতে কতগুলো টাকা লাগবে জানো না? চাকুরে ছেলের বাপ তো নগদই হেঁকে বসেছেন পাঁচ হাজার। তবু আমি পেছ্‌পা-হইনি। ধার ক'রে হোক, সে-টাকা আমি জোগাড় করবোই। তুমি সুপাত্রে পড়বে, তুমি সুখী হবে—এই-তো আমার আশা। ভদ্রলোকদের আমি কথা দিয়েছি, সব প্রায় ঠিকঠাক—এখন তুমি কিনা বলছো তোমার ইচ্ছে নেই!'

'আমাকে তো আগে কিছু বলোনি। আমাকে না-ব'লে তাঁদের যেমন কথা দিয়েছো—'

'চুপ!' গর্জ্জন করে উঠলেন হৃষীকেশবাবু, 'চুপ করো তুমি! তোমাকে আবার বলবো কী! তোমার আবার ইচ্ছা আর অনিচ্ছা কী। নিজের ভালোমন্দ, নিজের সুখ-দুঃখ তুমি কি কিছু বোঝ? আমি যা বলবো তা-ই তুমি করতে বাধ্য। এই আমি ব'লে দিলাম—এই এখানেই তোমার বিয়ে হবে, হবে, হবে। তোমার তুচ্ছ ছেলেমানুষী খেয়ালের জন্য এ-বয়সে আমি অপদস্থ, বেইজ্জৎ হ'তে পারবো না।'

অরুণা দ্রুত-পায়ে হেঁটে বাবার একেবারে কাছাকাছি মাথা তুলে দাঁড়ালো, সেই প্রভু-পুরুষের ভীষণ মূর্তির মুখোমুখি।

'তোমার তো ইজ্জৎ আর মান—আমার কী? আমার জীবন! আমার সমস্ত জীবন—আমার সমস্ত সুখ-দুঃখ, আশা-আকাঙ্ক্ষা সার্থকতা।

আমার জীবন নিয়ে তুমি খেলা করছো কোন অধিকারে? তোমাদেরই বা কোন কর্তৃত্বের খেয়ালে আমাকে আজ দাবার ঘুঁটি হ'তে হবে, রঙিন শাড়ী প'রে গিয়ে দাঁড়াতে হবে অপরিচিত পুরুষের চোখের সামনে নির্লজ্জ স্ত্রীলোকের মতো।। আমার বাবা হ'য়ে এ-প্রস্তাব করতে তোমার লজ্জা হ'লো না?'

অরুণার ঘন-ঘন নিশ্বাস পড়ছে, চোখ তার আগুনে ভরা, চুল তার বিশৃঙ্খলা, ছোটো-ছোটো দাঁত দিয়ে ঠোঁটের কোণ কামড়ে ধরছে। ভেঙেছে বাঁধ, জেগেছে জোয়ার, এখন সে সব করতে পারে, সব বলতে পারে—এতদিনের চাপা সুড়ঙ্গ-গুমরানি আজ হঠাৎ বেরিয়ে এলো কুল ভাসিয়ে। স্তব্ধ হ'য়ে তাকিয়ে রইলেন হৃষীকেশবাবু মেয়ের এই অভাবিত, অভাবনীয় মূর্তির দিকে। তারপর নিলেন চোখটা নামিয়ে, আস্তে বসলেন গিয়ে টেবিলের ধারের চেয়ারটায় মাথা নীচু ক'রে। একটু পরে বললেন—'এখন বুঝতে পারছি, তোমাকে শিক্ষা দিতে যাওয়াই আমার ভুল হয়েছে।'

'নিশ্চয়ই', তৎক্ষণাৎ ব'লে উঠলো অরুণা। ঠিক বলেছো। সবচেয়ে বড়ো ভুল হয়েছে আমাকে লেখাপড়া শেখানো। যদি আমাকে দিয়ে এই পুতুল-নাচ নাচাতেই তুমি চেয়েছিলে, তাহ'লে উচিত ছিলো আমাকে মূর্খ-নির্বোধ-নিরক্ষর রাখা, তাহ'লে আমাদের কাউকেই আজ এত দুঃখ পেতে হ'তো না, এত দুঃখ দিতেও হ'তো না।'

খাটের এককোণে মূর্ছিতের মতো প'ড়ে ছিলেন বিজয়া, চেষ্টা ক'রে বললেন, 'অরু, তুই চুপ কর, আর কথা বলিসনে, এদিকে আয়।'

দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন হৃষীকেশবাবু—'হে ঈশ্বর, এ-ও আমার কপালে ছিলো! আমি তো পাপ ক'রে তোদের জন্ম দিইনি—কেন তোরা এমন ক'রে আমাকে মারছিস!'

আর এক মুহূর্তে অরুণার ভিতরটা যেন টুকরো হ'য়ে ছিঁড়ে গেলো! কী সে করছে ভালো ক'রে বুঝতে পারলো না, ছুটে গিয়ে বাবার গলা জড়িয়ে ধ'রে বললে, 'বাবা, আমার কথা শোনো।'

হৃষীকেশবাবু ক্লান্ত, আরক্ত চোখে তাকালেন।

'বাবা, আমার উপর রাগ করো না, আমি শুধু আর-একটা কথা বলবো। তুমি তো পুরুষমানুষ, তুমি তো কত দেখেছো, কত জেনেছো, তুমি বুঝবে। বিয়ে আমি করবো না, এমন কথা তো আমি বলিনি। তোমরা আমার বিয়ে দেবার জন্য ব্যস্ত হয়েছো, বিয়ে আমি করবো। কিছুই ভাবতে হবে না তোমাদের—কত সুখী আমি হবো, কত সুখী তোমরা হবে। সে খুব ভালো বাবা, সে খুব ভালো।'

হঠাৎ যেন স্বপ্ন থেকে জেগে উঠে হৃষীকেশবাবু ব'লে উঠলেন—

'সে! সে-কে? কার কথা বলছো তুমি?'

আর সঙ্গে-সঙ্গে অরুণার হৃৎপিণ্ড পাতালে তলিয়ে গেলো, দুঃস্বপ্নের মতো আতঙ্ক যেন আঁকড়ে ধরলো তার কণ্ঠনালী। রুদ্ধস্বরে বললো, 'বাবা, আমি অশোককে বিয়ে করবো।'

সঙ্গে-সঙ্গে বিজয়া যেন বিদ্যুৎপ্রহত হ'য়ে উঠে বসলেন, আর হৃষীকেশবাবু হুংকারে সমস্ত ঘর কেঁপে উঠলো—'কী বলছিস্ তুই।'

বিজয়া উঠে এসে কাছে দাঁড়িয়ে বললেন, 'অশোক! আমাদের অশোককে তুই বিয়ে করবি'!

'ও, তাই!' হৃষীকেশবাবু অরুণার হাত তাঁর গলা থেকে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন, ছিটকে মেঝেতে লুটিয়ে পড়লো অরুণা। 'তাই!' এতক্ষণে বোঝা গেল ব্যাপারটা। সেইজন্যই ইচ্ছে নেই। ইচ্ছে থাকবে কেন? মনে যখন কু-প্রবৃত্তি জেগেছে, অন্য কিছুতে যে ইচ্ছে থাকবেই না।'

আর বিজয়া উদ্‌ভ্রান্তের মতো বলতে লাগলেন, 'অশোককে তুই বিয়ে করবি কী! পাগল! অশোক যে বদ্যি, ওরা যে অন্য জাত—এমন কথা স্বপ্নেও কী ক'রে ভাবলি তুই! অশোককে তো আমি নিজের ছেলের মতোই ভালোবাসতুম—ও-ছেলে এমন বদ, কে জানতো! ও-ই তো নষ্ট করেছে মেয়েটাকে, ও-ই তো মন্ত্র পড়িয়েছে কানে—নয় তো এমন শান্ত, এমন লক্ষ্মী মেয়ে আমার—' বিজয়ার গলা বুঁজে এলো, কথা শেষ করতে পারলেন না।

'আমার রক্তে জন্ম নিয়ে তুই আজ ছেনালি ক'রে বেড়াচ্ছিস।' হৃষীকেশবাবু হাড়-কাঁপানো চীৎকার ক'রে বলতে লাগলেন। 'এমন সন্তান

না-থাকলে কী হয়! টুকরো ক'রে তোকে যদি কেটে ফেলি—কী করতে পারিস তুই? উচ্ছনে যাবি, প'চে মরবি তুই, মা-বাবার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ক'রে কোনো সন্তান কখনো সুখী হয়নি পৃথিবীতে।'

ভয়ে পাগল হ'য়ে গিয়ে অরুণা দু'হাতে বাবার দুই পা জড়িয়ে ধরলো —'বাবা, অমন ক'রে শাপ দিয়ো না—সুখী হবো, আমরা সুখী হবো, আমরা সুখী হবো'—বলতে-বলতে ঝরঝর ক'রে কেঁদে ফেললে সে, 'অমন ক'রে শাপ দিয়ো না তুমি। বাবা, মা-গো, মা—তোমরা অমত করো না—আমি ওকে ভালোবাসি, ভালোবাসি—তুমিও তো মাকে ভালোবাসো বাবা, তেমনি-তেমনি—কিছু অন্যায় নয়, খারাপ নয়, আমরা বিয়ে করবো —বলো তো আজই, এক্ষুণি—ওকে বিয়ে না-করলে আমি বাঁচবো না, বাবা—মা, মা-গো—তুমি একটা কথা বলো তুমি তো বোঝো—আলাদা জাতে কী হয়, এমন তো কতই হচ্ছে আজকাল—মা, তুমিই তো ওকে কত ভালো বলতে, ও তো ভালো, ভালো; সত্যি ভালো—ওর মতো ভালো আর কে—একটু বলো না, মা, জাত দিয়ে কী হয়, সুখী হওয়াই আসল—বাবা, তুমি তো আমাকে সুখী দেখতেই চাও, তবে কেন বলছো না—বাবা-গো—'

অরুণার গলা ভেঙে এলো, চোখের জলে ভরা চকচকে চোখ নিয়ে তাকালো মুখ তুলে। হৃষীকেশবাবু টেনে সরিয়ে নিলেন তাঁর পা দু'টো। ঠাণ্ডা গলায় বললেন, 'তুমি আমার নষ্ট মেয়ে—এখান থেকে যাও।'

তীরের মতো সোজা হ'য়ে উঠে দাঁড়ালো অরুণা। একটা তীরে ছুটে যেতে-যেতে যেমন শব্দ ক'রে তেমনি স্বরে বললে, 'কী! আমি তোমার নষ্ট মেয়ে!'

হৃষীকেশবাবু বললেন, 'তোমার ব্যবস্থা আমি পরে করবো—এখন আমার চোখের সামনে থেকে যাও তুমি।'

অরুণা কিছু না-ব'লে মাথাটা একবার ঝাঁকালো, তার শিথিল খোঁপা ভেঙে লম্বা কালো চুল ছড়িয়ে পড়লো সারা পিঠে। আর তার চোখে কান্না নেই, তার পাৎলা বাঁকা ঠোঁটে ঈষৎ যেন হাসির ছায়া।

একটু সময়, মৃত্যুর মতো স্তব্ধতা রইলো ঘরের মধ্যে। হঠাৎ বিজয়া

আর অরুণা দু'জনেই চমকে উঠলো হৃষীকেশবাবুর কণ্ঠস্বরে—

'কী-হে, তুমি আবার এখানে কেন ?'

দু'জনেরই চোখ একসঙ্গে দরজার দিকে গেলো। এইমাত্র স্নান ক'রে এসেছে সুমন্ত্র, গায়ে পাতলা ফুরফুরে পাঞ্জাবী, পরিপাটি আঁচড়ানো চুল। এ-ঘরে কলরব সারা বাড়ি থেকেই অবশ্য শোনা যাচ্ছিলো, সুমন্ত্রও শুনছিলো। প্রথমটায় বুঝতে পারেনি, একটু পরেই বুঝেছিলো ব্যাপারটা। সত্যি বলতে, ক-দিন ধ'রে এই বিস্ফোরণেরই সে প্রতীক্ষা করছে। শোনবার পর তার ঝোঁক হয়েছিলো উপরে ছুটে যেতে, অরুণার পাশে গিয়ে দাঁড়াতে। অতি কষ্টে চেপে গিয়েছিলো সেটা। হাজার হোক, তার তো এতে কিছু নয়। পাছে নিজেকে সামলাতে না-পেরে চ'লে যায়, গেল স্নান করতে। স্নান ক'রে এসেও দেখলো, থামেনি। এখনো শোনা যাচ্ছে গুমগুম গলা। আহা—বেচারাকে কত লাঞ্ছনাই না জানি দিচ্ছে। তারপর কানে এলো অরুণার একটু কান্নার শব্দ। আর টিঁকতে পারলো না। মনস্থির ক'রে চলো উপরে।

হৃষীকেশবাবু বললেন—'এসেছো যখন, শুনেই যাও খবরটা। তোমার ভগ্নী তোমার বন্ধু অশোক সেনকে বিয়ে করতে চায়। রীতিমতো রোমান্টিক শোনাচ্ছে—কী বলো ?'

সুমন্ত্র বললে, 'তা বিয়ে করতে চায় করবে, ভালোই তো।'

'আরে তুমি তো এ-কথা বলবেই। তুমি নিজে কোনদিন এ-রকম একটা কাণ্ড করো, তার তো কিছু স্থির নেই। কোন এক বেজাত-বজ্জাত মেয়ে—তোমার মতো ছেলের কপালে তার বেশী আর কি জুটবে। সে যা-ই হোক, তোমার বন্ধুকে তুমি ব'লে দিয়ো, সে যেন আর এ-বাড়ির ছায়া না মাড়ায়।'

'আমার বন্ধুকে আমি নিশ্চয়ই বলে দেবো সে যেন আমার বাবার বাড়িতে আর না আসে।'

'বেশ—বেশ তা হলেই হ'লো। তোমার যখন নিজের বাড়ি হবে, তুমি তোমার অসভ্য-ইয়ার বন্ধুদের নিয়ে যত ইচ্ছে নাচানাচি-মাতামাতি করো। ঈশ্বরের কাছে এই বলি অতটা যেন আমাকে আর দেখতে না হয়। তার

আগেই যেন—'

দীর্ঘশ্বাস ফেলে হৃষীকেশবাবু চুপ ক'রে গেলেন। বিজয়া তাড়াতাড়ি বললেন, 'থাক—থাক, এখন চুপ করো তো তুমি। এই দুপুরবেলায় আর-একটা সোরগোল বাঁধিয়ো না। মন্তু, তুই নীচে যা।'

সুমন্ত্র বললে 'একটা কথা জিগ্যেস করি। এ-বিয়ে কি হবে না?'

হৃষীকেশবাবু জবাব দিলেন, 'কী হবে না হবে, তা তোমার জিগ্যেস করবার তো কোনো দরকার নেই।

'তার মানেই হবে না। কিন্তু কেন হবে না জানতে পারি?'

'ফের! ফের তুমি কথা বলছো, মন্তু!'

অরুণা সুমন্ত্র'র কাছে গিয়ে বললে, 'দাদা, তোমার পায়ে পড়ি তুমি নীচে যাও।'

তবু সুমন্ত্র বললে, 'তুমি যদি সত্যি তোমার মেয়েকে ভালোবাসতে, তাহ'লে এক্ষুণি এ-বিয়ের ব্যবস্থা করতে।

শূন্যে হাত ছুঁড়ে গর্জন ক'রে উঠলেন হৃষীকেশবাবু, 'তাই তো, তাই তো! আমি তো আমার মেয়েকে ভালোবাসি নে, আমি তো আমার ছেলেকে ভালোবাসি না—কোনোদিন তোদের কাউকে আমি ভালো-বাসিনি! তোকে আগেই চিনেছিলাম, অরুণাকে আজ চিনলাম। এতদিন তোদের জন্য প্রাণ দিয়েছি—আজ উপযুক্ত প্রতিশোধ নিচ্ছিস তোরা। অকৃতজ্ঞ-নেমকহারাম-বেইমান সব—'

'কী করেছি আমরা, যে তুমি এমন ক'রে বলছো? কী করেছি আমি? কী করেছে অরুণা? মেয়েটাকে যে আজ তোমরা এমন ক'রে যন্ত্রণা দিচ্ছো, সাধ্য আছে তোমাদের অশোকের চেয়ে ভালো ছেলের হাতে ওকে দিতে পারো?'

'মন্তু-মন্তু—' আর্তস্বরে ডেকে উঠলেন বিজয়া, 'চুপ কর তুই, যা এখন এখান থেকে!'

কিন্তু সুমন্ত্র বলতেই লাগলো—'দৈবাৎ ওর জাত আলাদা, তাতে কী হয়েছে! এতবড়ো নিষ্ঠুর তোমরা, একটা কুসংস্কারের জন্য মেয়েটাকে মেরেও ফেলতে পারো! এর নাম আবার ভালোবাসা!'

চীৎকার ক'রে উঠলেন হৃষীকেশবাবু, 'অপগণ্ড নাবালক শিশু—তোরা কী বুঝবি মা-বাবার প্রাণের কথা! আজ আমি এই প্রার্থনা করি ঈশ্বরের কাছে—তোদের যেন কখনো ছেলেমেয়ে না হয়, এ-কষ্ট তোরা যেন কখনো না পাস জীবনে!'

কেন কষ্টটা কী? কষ্ট তো নিজেরাই পাচ্ছো নিজেদের দোষে। ছেলে-মেয়েকে কেবল ভালোবাসলেই হয় না, মানুষ হিসেবেও ভাবতে হয় তাদের। কী অন্যায় করেছি আমরা, কখন অকৃতজ্ঞতা করলাম? আমরা আলাদা মানুষ, আমাদের স্বতন্ত্র ইচ্ছে আছে। তোমাদের সঙ্গে আমরা একাত্ম নই—এই তো আমাদের দোষ। কিন্তু একাত্ম হওয়া কি সম্ভব?'

'এই তো—এই তো ছাখো—অরুণা তার দাদার কাছেই দীক্ষা নিয়েছে, তাকে আর দোষ দেবো কী! স্বাধীন হয়েছিস তোরা, এই একটা বুলি আজকাল তোদের মুখে। এক-একটি সন্তানকে লালন ক'রে তোলা যে-কী, তা তোরা বুঝিবি কেমন ক'রে! আর সেখানেই যদি শেষ হ'তো!'

'একথা বার-বার শোনাচ্ছো কেন। যে কষ্ট ক'রে আমাদের মানুষ করেছো, সে-কষ্ট তো সকলেই করে, সে তো করবেই! তার জন্য কেউ কি কখনো প্রতিদান চায়? যেটা প্রকৃতিরই নিয়ম সেটার জন্য বাহবা চায় কে? যত কিছু করছো আমাদের জন্য, এখন কি তারই দ্বিগুণ আদায় ক'রে নিতে চাও জোর করে খাটিয়ে অত্যাচার ক'রে?'

অরুণা আবার বললো, সুমন্ত্র'র একটা হাত চেপে ধ'রে—'চুপ করো দাদা, চুপ করো।'

'ছেলেবেলা থেকে শুনছি', সুমন্ত্র বলতে লাগলো, 'যে স্নেহ দিয়েই তৃপ্তি, স্নেহ কিছু ফিরিয়ে চায় না। কিন্তু এখন দেখছি যে তোমারা ফিরিয়ে নিতে চাও—তোমরা চাও বাধ্যতা, দাসত্ব। ছেলেমেয়েকে চাও নিজের মুঠোর মধ্যে। চাও নিজের অপ্রতিহত কর্তৃত্ব। তারা কী খাবে, কী পরবে, কার সঙ্গে কথা বলবে, কখন বেড়াবে, ক'টার সময় শোবে—সব তোমরা ব'লে দেবে। জীবনের তুচ্ছ থেকে বৃহত্তম সমস্ত ব্যাপার একান্ত মুখাপেক্ষী হয়ে থাকবে তোমাদেরই। গৃহপালিত পশুরও নিজের আলাদা ইচ্ছে থাকে, তাও তাদের থাকবে না। তবে হ'লো গিয়ে ভালো ছেলে।

আর সেই মূঢ় দাসত্বের যেই একটু ত্রুটি হ'লো, অমন জ্বলে উঠে বললে—বেইমান-নেমকহারাম-অকৃতজ্ঞ। কৃতজ্ঞ থাকে চাকর, ছেলে কখনো কৃতজ্ঞ থাকে?

'মন্তু,' বিজয়া উঠলেন ব্যাকুলভাবে 'মন্তু, চুপ কর তুই।'

হৃষীকেশবাবু হাত তুলে বললেন—'বলতে দাও ওকে, বলতে দাও··· সব শুনি। এ-বয়েসও অনেকখানি বাকি ছিলো, দেখছি; পূর্ণ হোক। ও-তো বলবেই এ-রকম—ও তো জানে না, কত রাত আমাদের জেগে ব'সে কেটেছে ওকে নিয়ে, কত সুখে বাধা পড়েছে, ব্যর্থ হয়েছে কত ইচ্ছা, নষ্ট হয়েছে কত আশা। ও-তো জানে না, স্বাধীনতা ব'লে আমাদের কিছুই ছিলো না, এখনো নেই, এখনো আমাদের সমস্ত জীবন ওদেরই জন্য। ও তো জানে না শরীরের যত অসংখ্য দুর্ভোগ, মনের যত দুশ্চিন্তা, জানে না ব্যথা, জানে না সমস্যা, জানে না শিশুর প্রতিকারহীন অত্যাচার। বার-বার এমনি কেটেছে ওদের নিয়ে। তারপর আজ যখন ওদের জীবনের সিংহদরজায় প্রায় পৌঁছিয়ে দিলুম, আজ ওরা বলছে—ওতো তোমরা করতে বাধ্য!'

'বাধ্য নয়?' এক মুহূর্ত দেরী না-ক'রে ব'লে উঠলো সুমন্ত্র। 'আমাদের জলে ভাসিয়ে দিতে পারতে না তো! আর এ-কথা কি বলবে যে, যত কিছু করতে হয়েছে তাতে কেবলই দুর্ভোগ আর দুশ্চিন্তা—তাতে কোনো সুখ ছিলো না, কোনো মাধুর্য ছলো না? আর সেই শৈশবটাই যেন চিরকালের—এমনি তোমাদের মনের ভাব। এমন দিন যে আসে যখন আমরা আর শিশু থাকি না, এটা যেন মনেই আনতে পারো না তোমরা। একটা বয়স পর্যন্ত আমাদের জীবন থাকে মা-বাবার সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়ানো, কিন্তু একদিন ছেদ আসে, একদিন ছেদ আসতেই হয়, না-এলেই সর্বনাশ। কুড়ি-বাইশ বছরের খোকাখুকু মানেই হাবা। তেমনি একদিন শিশু থাকে মাতৃগর্ভে নাড়ির পাকে-পাকে জড়ানো; কিন্তু সে-বন্ধন একদিন ছিঁড়ে যায়, সেটাই মুক্তি। পরবর্তী জীবনে আর-একবার আছে ছিন্ন হবার, বিচ্ছিন্ন হবার সময়—সেটাকে স্বীকার ক'রে নিতে না পারা অপ্রকৃতিস্থতা। তখন নিজের ছেলেমেয়েকে সম্মান করতে

হয় স্বতন্ত্র মানুষ বলে। মানুষের সঙ্গে মানুষের যে-সহজ অনাড়ষ্ট সম্বন্ধ, তাছাড়া আর-কোনো সম্বন্ধ তখন টিঁকতেই পারে না। যে-নিবিড় বন্ধন অণুতে-অণুতে মা-বাবার সঙ্গে শিশুর, তখন সেটা ছিঁড়ে ফেলতেই হয়—ছিঁড়ে যায়ই সেটা—নয় তো সে-স্নেহ নাগপাশ হ'য়ে উঠে উভয় পক্ষকেই পিষে মারে। দেখলে তো? একবার এ কথা তুমি মনে-মনে মেনে নাও যে, আমরা বড়ো হয়েছি। তারপর দেখবে কোনো সমস্যায় তোমার আর থাকবে না।'

'হৃষীকেশবাবু চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। 'মন্তু, এত কথা তোমাকে কেন বলতে দিলুম, জানি নে। কিন্তু অনেক হয়েছে, আর নয়। তুমি যাও—অরুণা, তুমিও যাও তোমরা আমার চোখের সামনে থেকে, বেরোও এক্ষুনি। যেখানে খুশী যাও, যা ইচ্ছে হয় করো। তোমরা যে আমার কিছু, এটা যেন আমি ভুলতে পারি।'

তারপর আর সারা বাড়িতে একটা কথা বলা হ'লো না। হৃষীকেশ-বাবু স্নান ক'রে খেলেন, সুমন্ত্র গিয়ে একা-একা খেয়ে এলো। অরুণা নাইলো না, খেলো না, বিজয়া প'ড়ে রইলেন না-খেয়ে মেঝেতে পাটি পেতে। বেলা গড়িয়ে তিনটে বাজলো। ভদ্রলোকেরা এলেন, হৃষীকেশবাবু নীচে গিয়ে কী কথা বললেন, তাঁদের সঙ্গে তা আর-কেউ শুনলো না। ভদ্র-লোকেরা আবার চলে গেলেন।

* * *

'টুনকি, শোন!'

টুনকি বারান্দা দিয়ে নীচে নেমে যাচ্ছিলো, দিদির ডাকে দরজার কাছে এসে দাঁড়ালো।

'আয় এখানে।'

টুনকি ঘরে ঢুকে কাছে এলো, নিঃসংকোচে নয়। তার দু-কাঁধের উপর দু'হাত রেখে অরুণা বললে, 'শোন একটা কথা।'

বড়ো বড়ো গম্ভীর শিশু-চোখ তুলে তাকালো টুনকি।

'শোন—আমি যদি চ'লে যায় এখান থেকে, কেমন হয় তবে বলতো?'

'যাবে নাকি, দিদি?'

'বাঃ, যাবো না? বিয়ে হবে না আমার? তুই-ই তো বললি সেদিন?'

'কই, বিয়ে তো তোমার হ'লো না। তারা তো ফিরে গেলো।'

'সব খবরই রাখিস দেখছি।'

টুনকি লজ্জিতভাবে বললে, 'মা তো সেইজন্যই এত কাঁদছেন।'

অরুণা হেসে বললে, 'দূর বোকা—মা-রা আবার কাঁদেন নাকি? বড়োরা কি কাঁদে?'

টুনকি চুপি-চুপি বললে 'তবে তুমি যে—'

'যাঃ—আমি কাঁদি? পিণ্টু কাঁদে, গোপলা কাঁদে, তুই কাঁদিস—'

টুনকি প্রতিবাদ করলে, 'আমি কাঁদি না।'

অরুণা একটু চুপ করে থেকে বললে, 'শোন, একদিন হয়তো দেখবি, আমি চ'লে গেছি।'

'কোথায় যাবে?'

'কোথায়? জানি না।'

'তা আবার আসবে তো—আসবে না? দিদিরা বিয়ে হ'য়ে চ'লে যায় —আবার তো আসে, মাঝে-মাঝে আসে না?'

'সবই তো জানো তুমি বুড়ি-ঠাকরুণ। তোমার আর ভাবনা কী।'

'তুমিও তো আবার আসবে?'

'যদি না আসি?'

'যাঃ!'

'যদি না আসি, তবে কি তুই খুব রাগ করবি আমার উপর?'

টুনকি মাথা নীচু ক'রে রইলো।

অরুণা টুনকির কপালে একটা চুমু খেয়ে বললে, 'রাগ যত খুশী করিস, কিন্তু দিদিকে কখনো খারাপ ব'লে ভাবিস্‌নে—কেমন?

টুনকি মাথা তুললে তার চকচকে চোখের উপর চোখের পাতা পড়লো কয়েকবার। হাত সরিয়ে এনে অরুণা বললে, 'যা এখন।'

টুনকি তবু দাঁড়িয়ে রইলো কোল ঘেঁষে। অরুণা আবার বললে, 'কখনো আমাকে খারাপ ব'লে ভাবিসনে, ঠিক তো?'

টুনকি কিছু বললে না, কেমন অদ্ভুত ক'রে তাকিয়ে রইলো মুখের

মা হয়তো গায়ে একটু হাত বুলোতেই যাচ্ছিলেন, অরুণা হালকা ভঙ্গিতেই দূরে স'রে বললো—'থাক মা, এ-সব কথা এখন থাক।'

একটু চুপ ক'রে থেকে বিজয়া বললেন, 'তুই কী পাগল নাকি অরু, যে ঐ অশোক ছেলেটাকে বিয়ে করার কথা ভাবলি? তা কি হয় কখনো? ওর যে জাত আলাদা—ওর বাবা জানতে পারলে তিনিই কি রাজী হতেন ভেবেছিস?'

'কেন তুমি বোঝাচ্ছো, মা? আমি তো কিছু বলছি না—তোমাদের কথা সবই তো আমি বুঝি।'

বিজয়া চুপি-চুপি বললেন, 'ছাখ, ছেলেটার মা নেই, বাড়ির টান নেই—ঘুরে-ঘুরে বেড়ায়, তাই বড়ো মায়া লাগতো। এত আদর-যত্নের প্রতিদানে তোর মনে এই বিষ ঢোকানো কি ওর উচিত হয়েছে? ভেবে ছাখ—তুই-ই বল। যেটা অসম্ভব, যেটা কখনোই হবার নয়, সেটার মধ্যে তোর কাঁচা মনটাকে টেনে নিয়ে যাওয়া—ও যদি সত্যি ভালো হ'তো, তাহ'লে কি এমন কাজ করতো কখনো?'

অরুণা জবাব দিলে না; তার মুখেরও ভাবান্তর হলো না।

তেমনি নরম সুরে, তেমনি ঘায়ে মলম-লাগাবার মতো ঢঙে বিজয়া বলতে লাগলেন, 'আমি বলি তোকে···এ নিয়ে আর ভাবিসনে তুই। এখন খুব কষ্ট হচ্ছে, কিন্তু এ-কষ্ট বেশীদিন থাকবে না—'

এবার অরুণা একটা মন্তব্য না-ক'রে পারলো না, 'কোন কষ্টই বা বেশীদিন থাকে, মা? ছেলে ম'রে যায়—সে-কষ্টই কী মা-র মনে থাকে চিরকাল?'

বিজয়া একটু বিচলিত হ'য়ে বললেন 'কী—যে বলিস তুই অরু, বুদ্ধিসুদ্ধি সবই কি খুইয়েছিস? অশোকের সঙ্গে অনেকদিন দেখাশোনা না হ'লেই দেখবি মনটা বেশ শান্ত হ'য়ে আসছে!'

এবারেও অরুণা জবাব না-দিয়ে পারলে না, 'আমি যদি আজ নিরুদ্দেশ হ'য়ে যাই, তাহ'লে তুমিও তো প্রথম কয়েকদিন খুব কান্নাকাটি করবে—না? আর তারপর সেটাই তো তোমার স'য়ে যাবে, অভ্যেস হ'য়ে যাবে—তা-ই না? তারপর আবার তুমি হাসবে, আবার চাকরদের সঙ্গে

খিটিমিটি করবে, আবার দুপুরবেলায় খাওয়ার পরে মাসিকপত্রিকা হাতে নিয়ে শোবেও। সবই করবে। তাই ব'লে কি এটা প্রমাণ হ'লো যে, তুমি আমায় ভালোবাসতে না?'

'কী-যে বলিস! কিসের তুলনা করিস তুই। অরু, আমার কথা শোন, অরু, মনটাকে একটু স্থির কর। তোর অমতে আর-কিছু হবে না। আমরা দেখে-শুনে এমন জায়গাতেই তোর বিয়ে দেবো, যেখানে তোর মত হবে। ছাখ্, এমনিতেই আমরা এখন নানা দুশ্চিন্তায় বিব্রত, তার উপর অশান্তি বাড়াসনে। মন ভালো কর—সবই ঠিক হ'য়ে যাবে দু'দিনে। তোর বাবার ওপরে রাগ ক'রে কী করবি—তাঁর কি মাথার ঠিক আছে? জানিস তো তিনি রাগী মানুষ, একবার রাগ উঠলে বলতে না পারেন, এমন কথা নেই। তার উপর ছাখ্, এই ক-দিন ধ'রে রাত্রে ঘুম নেই, তাঁর মনে নেই মুহূর্তের শান্তি। প্রাণের চেয়ে তিনি ভালোবাসেন তোদের—আর তোরা কি তাঁকে এমন ক'রে কষ্ট দিবি?'

বিজয়ার চোখে করুণ মিনতি ফুটে উঠলো।

এটা অবৈধ, এটা হীন, অরুণার মনে হ'লো, মানুষের হৃদয়বৃত্তির দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে জিতে যাবার এই চেষ্টা। হীন এটা কিন্তু অরুণা, তোমার আবার হৃদয়, আর তোমার আবার স্নেহ-মমতা—তুমি তো নষ্ট মেয়ে, তোমার বাবা তোমাকে প্রাণের চেয়ে ভালোবাসেন। নষ্ট মেয়ে তুমি। তোমাকে হাতে ধ'রে বলা হচ্ছে, তোমার বাবাকে তুমি কষ্ট দিয়ো না, নিজে তুমি যত কষ্টই পাও—দু'দিনেই ভুলে যাবে। তুমি সব সহ্য করবে, তুমি নিজের গলা টিপে ধ'রে শান্ত হবে, আরকেই বা শান্ত হবে না, আর-কেউ কিছু সহ্য করবে না। তুমি তো নষ্ট মেয়ে।

অরুণা উঠে দাঁড়ালো—'যাই, মা, স্নান করতে, বেলা হ'লো।'

বিজয়া একটু অবাক হ'য়েই তার মুখের দিকে তাকালেন। যেন সবে গানের আলাপ শেষ ক'রে এনেছে, এমন সময় শ্রোতা 'বাঃ, বেশ' ব'লে উঠে দাঁড়ালো।

'তা'হলে তুই—কী ঠিক করলি?'

মেয়ের মুখ থেকে নির্দিষ্ট কিছু শোনার আশা করলেন বিজয়া।

'আমরা কিছু ঠিক করবার কে মা, অদৃষ্টই যা ঠিক করে।'

ব'লে অরুণা বেরিয়ে গেলো ঘর থেকে, মায়ের মুখের দিকে ভালো ক'রে একবার তাকালোও না। গেলো স্নানের ঘরে। অদৃষ্ট দিয়েছে ঠিক ক'রে। এখন আর কোনো ভাবনা নেই। কাল সে যাবে। অশোক খবর পাঠিয়েছে সুমন্ত্রকে দিয়ে। সে যাবে। যাবে-যাবে-যাবে। কোনো ভাবনা আর নেই এখন। সে তো নষ্ট মেয়ে—তার আবার ভাবনা কী?

অন্ধকার। অন্ধকার আর হাওয়া। হু-হু করে, গুমগুম ছুটে চলেছে রেলগাড়ি। অন্ধকার গুঁড়ো-গুঁড়ো হ'য়ে গেলো, রাত্রির বুক ভেঙে গেলো। খাঁচার মতো ছোটো একটি ইণ্টারক্লাশ কামরা চার-পাঁচজন যাত্রীর দখলে। জানলার ধারের দিকে তাকিয়ে অরুণা। নির্ঘুম উজ্জ্বলতা তার চোখে, তার পাশে অশোক ঘুমে ঢুলছে, থেকে-থেকে আধো জেগে উঠছে গাড়ীর ঝাঁকুনিতে। অন্যান্য যাত্রীর শোয়া-বসার বিভিন্ন অবস্থায় ঘুমে বিভোর। গাড়ীর গর্জন ছাড়া পৃথিবীতে আর-কিছু নেই।

একটু পরেই শব্দের ঢেউ-তোলা রাত্রির সমুদ্রে একটা দ্বীপ ভেসে উঠলো। গাড়ী থামলো, স্টেশন। সঙ্গে-সঙ্গে অশোক জেগে উঠলো অস্পষ্ট আধো-ঘুম থেকে, যেমন তন্দ্রা প'ড়ে যাওয়ায় স্বপ্ন দেখতে-দেখতে হঠাৎ খাটের পায়ার ধাক্কায় আচম্‌কা চমকে জেগে উঠে।

অরুণা মুখ ফিরিয়ে ফিশফিশ ক'রে বললে, 'রানাঘাট!'

'রানাঘাট!' অশোক পুনরুক্তি করলে, স্বস্তির নিশ্বাস ছেড়ে।

'আর কত দূর?'

'আর কী? হ'য়ে এলো।'

'হয়ে এলো'। অরুণা হঠাৎ শিউরে কেঁপে উঠলো, যেন ভিতর থেকে একটা হাওয়া উঠলো লাফিয়ে।

'কী?' অশোক সেটা লক্ষ্য করলে। 'কাঁপছো নাকি?'

'না—না,' হাসির চেষ্টা ক'রে অরুণা বললে, 'ও কিছু না।'

জানালা দিয়ে মুখ বের ক'রে অরুণা প্লাটফর্মের দুই সীমান্ত দেখতে

লাগলো। তারপর হঠাৎ মাথা টেনে আনলো ভিতরে। কেমন ফ্যাকাশে মুখে তাকালো অশোকের দিকে।

অরুণা কথা না-ব'লে দু'হাতের মধ্যে মুখ লুকোলো। একটু পরে রেল-পুলিশের দু'জন কর্মচারী হেঁটে গেলো প্লাটফর্ম দিয়ে।

দীর্ঘ একটা নিঃশ্বাস পড়লো অশোকের। ঢোঁক দিলে ডাকলো, 'অরুণা!'

'উঁ?'

'অরুণা, মুখ তোলো।'

'গেছে?'

'ও কিছু না, শোনো।'

ছাইয়ের মতো মুখে অরুণা চাপা গলায় বললে, 'পারবো তো?'

'কী—কী পারবো?'

'পারবো তো পৌঁছতে?' অরুণা নিজের মুখের উপর একবার হাত বুলিয়ে নিলো, তারপর মাথার দু'দিকের রগ দু'টো টিপে ধরলো দু'আঙুলে।

'আর কী—এসে তো গেলাম,' অত্যন্ত বেশী সহজ হ'তে গিয়ে অশোকের গলা একটু কেঁপে গেলো। বললো 'আবার মাথা ধরলো নাকি?'

'ধরছে একটু।'

'একটুও ঘুমোলে না!'

'ঘুম!' অরুণা বোকার মতো হি-হি ক'রে হেসে উঠলো একবার।

'আমি যা-ই হোক, ফাঁকে-ফাঁকে ঘুমিয়ে নিয়েছি।'

অরুণা ফিশফিশ ক'রে বললে—'ঐ লোকটাকে ছাখো'।

'কোন লোকটাকে?'

অরুণা সে-দিকে না-তাকিয়ে বললে, 'তোমার উল্টো দিকের বাঙ্কে—আমাদের দিকে তাকিয়ে আছে!'

অশোক উদাসীনভাবে পুরো কামরাটা দেখে নিয়ে সেই লোকটিকেও দেখলে। বললে—'না-তো!'

'চেনে নাকি আমাদের?'

'কে জানে!'

গাড়ীটা ছাড়েই না বা কেন!'

নিজের চিন্তার অনুধাবন ক'রে অশোক বললে, 'চেনা হ'লেও তোমাকে-আমাকে একসঙ্গে দেখে নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারবে না। সে-ই ভরসা।'

আর কেউ নামলো না, আর কেউ উঠলোও না, তবু গাড়ীটা অকারণে আরো খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলো। এই শেষ ঘণ্টা যেন আর কাটে না। সারা পথ এমনি ক'রেই এসেছে তারা—প্রতি অচেনা দৃষ্টিতে ভয় পেয়ে-পেয়ে প্রতি কথায় চমকে, প্রতি শব্দে কেঁপে উঠে-উঠে। এবারে শেষ হ'য়ে এলো পথ, ভোর হ'লো ব'লে। ঈশ্বর, এই সময়টুকু আমাদের রক্ষা করো, আর-একটু সময় বাঁচিয়ে রাখো আমাদের। গাড়ী ছাড়লো। বাঙ্কের লোকটি কনুইয়ে ভর দিয়ে আধো উঠে বসেছিলো, আবার রাত্রির সমুদ্রে ট্রেনের শব্দের ঢেউ।

জোরে হাওয়া লাগলো, সহজে নিঃশ্বাস পড়লো দু'জনেরই। এবার তারা একটু গলা খুলে কথা বলতে পারে, গাড়ীর এত শব্দ।

অশোক খুব সংক্ষেপে বললে, 'ভয়?'

'উঁ?'

'ভয় করছে নাকি?'

'না—না, ভয় কিসের—'অরুণা ঢোঁক গিললো।'

অশোক পকেট থেকে একটা জিনিস বের ক'রে বললে, 'নাও!'

'কী?—ও, চকোলেট।'

'খাও এটা। সারাটা রাস্তা কিছু তো খেলে না।'

'তুমিও তো খেলে না কিছু।'

'তুমি না-খেলে আমি খাই কেমন ক'রে?'

'তোমার কি—খিদে পাচ্ছে?'

'প্রচণ্ড। সিগারেটও আর ভালো লাগছে না।'

চকোলেটের অর্ধেকটা ভেঙে অরুণা বললে, 'খাও।'

'আমার এই বিশাল জঠর-গহ্বরে তোমার ঐ একটুখানি চকোলেট কী করবে! তুমিই খাও, একজনের পেট ভরুক অন্তত।'

অরুণা হেসে বললে, 'তুমি কি বলতে চাও এর সমস্তটায় আমার পেট

ভরবে ?'

অশোক পকেট চাপড়ে বললে—'ভয় নেই—আরো আছে।'

'আরো! সারা রাস্তা তো এই খেতে-খেতেই এলাম—চকোলেটের পাহাড় নিয়ে এসেছিলে নাকি ?'

'এর নাম দূরদৃষ্টি—বুঝলে ? এরই জোরে মানুষ কৃতী হয়, জয়ী হয়—অনেক কিছু হয়। জয়ী হওয়ার রাস্তায় চলেছি কিনা ? তাই ঠিক-ঠিক গুণগুলোই বর্তেছে।'

আর যে-ক'টা চকোলেট ছিলো, দু'জনে ভাগাভাগি ক'রে খেয়ে নিলো। আর অরুণা বললো, 'ছাখো তো ঘড়িটা একবার।'

'ঘড়ির দিকে যত ঘন-ঘনই তাকাও, সময়টাকে তো আর এগিয়ে দিতে পারবে না। নৈহাটি-ব্যারাকপুর-দমদম-কলকাতা।' তারপর একই সুরে বললে, 'হোটেল, খাওয়া স্নান, রেজিস্টারের আপিশ ; হোটেল, খাওয়া, ঘুম। বন্ধুকে লিখে দিয়েছি, সে-সব ব্যবস্থা করবে।'

'শীগগিরই চ'লে আসবে।'

'ট্যুশানি করতে-করতে এম, এ পাশ করবো, তুমি মাষ্টারী করতে-করতে বি, এ, পাশ করবে।'

'কেন, এম-এ, পাশ করতেও পারি না বুঝি ?'

'তাও তো বটে। বেশ তাহ'লে। তুমি ফার্স্ট ক্লাশ এম, এ, হ'য়ে মেয়ে-কলেজের প্রিন্সিপাল হ'য়ে বসবে, আমাকে তখন পার্সোনাল অ্যাসিস্ট্যাণ্ট ক'রে নিয়ো কিন্তু—পুরুষ ব'লে বাতিল করো না'।

অরুণা হেসে উঠলো। বললে—'একটা ভাব হচ্ছে। তোমার ঐ হোটেলে উঠে তো স্নান করবো, তখন—' অরুণা কথার মাঝখানে চু'প ক'রে গেলো।

কথাটা বুঝে নিয়ে অশোক বললে, 'ভয় নেই, আমার দূরদৃষ্টির আর-একটা জ্বলন্ত প্রমাণ দিচ্ছি! আমার ঐ চামড়ার বাক্সটার তলায় গোটাকয়েক শাড়ী আত্মগোপন ক'রে আছে। বেশীর ভাগ ঘরোয়া ধরনের, খান দুই শৌখিন। তারই একখানা প'রে তুমি যাবে রেজিস্ট্রার মহাশয়ের সমীপে।'

'বাবাঃ!' অরুণা অবাক হ'লো 'এত জোগাড় করলে কোত্থেকে ?'

সে-কথার জবাবে অশোক বললে, 'তুমি তো কিছুই আনোনি—'

অরুণা মাথা নাড়লো। অশোক বললে—'যাকগে—তাতে আর কী? অন্য যে-সব বিচিত্র পরিধেয় তোমাদের মেয়েদের দরকার হয়, তা কিনে নিতে পারবে কলকাতায় আধঘণ্টার মধ্যে।'

অরুণা একবার তাকালো, কিছু বললে না।

'ঘুম পাচ্ছে?'

'না।'

'ঘুমোও একটু! শুতেও পারো ইচ্ছে করলে।'

অরুণা বললে, 'না'।

তারপর জানলার উপর দু'হাত রেখে মাথা লুকোলো তার মধ্যে। হু-হু হাওয়া, গাড়ী চলেছে পুরো দমে, অন্ধকারকে টুকরো-টুকরো ক'রে ছিঁড়ে। গাড়ী চলেছে, কলকাতা এলো ব'লে।

রেজিস্ট্রারের আপিশ থেকে রাস্তায় বেরিয়ে অশোক বললো, 'আর কী। এখন আমরা স্বামী-স্ত্রী। এখন আর ভয় কী?'

উজ্জ্বল কালো চোখ তুলে তাকালো অরুণা। বেলা বারোটা দুপুর ঝলসানো সাদা রোদে এই বৃহৎ ব্যস্ত শহর, সমস্ত যানবাহন, লোকজন, বাড়ি-ঘর নিয়ে অরুণার চোখে লাগলো এক সিনেমার ছবির মতো। দীর্ঘশ্বাস পড়লো তার, যেন অবিশ্বাস্য সুখে। তাদের বিয়ের দলিলের কাগজটা বিজয়ী নিশানের মতো ঊর্ধ্বে লাফিয়ে উঠলো, অশোকের হাতের মুঠোয়।

অশোক বললে, 'এই নাও—পৃথিবী!'

অরুণা বললে, 'কাগজখানা সাবধানে পকেটে রেখে দাও—হারিয়ে ফেলো না আবার।'

খুশীতে উচ্ছ্বসিত হ'য়ে অশোক বলতে লাগলো, 'এখন আমরা কোনদিকে যাই—কোথায় যাই বলো। অনন্ত সময়। এখন আমরা হাওয়ার মতো, এখন আমরা জলের স্রোতের মতো। কেউ আমাদের বাঁধতে পারে না' তারপর এক চুপ থেকে বললে—'চলো, হোটেলেই ফিরি, লম্বা ঘুমে দিনটা শেষ হোক।'

ট্যাক্সি ডেকে উঠে পড়লো তারা। অরুণা একটু ঘুরিয়ে নিয়ে গেলো গাড়ীটাকে—কিনলো ফুলের তোড়া, কিনলো ফুলের মালা, ধূপকাঠি, অশোক কিনলো সন্দেশ আর সিগারেট।

আর হোটেলের ছোটো ঘরে গিয়ে দরজা বন্ধ ক'রে দিলো। বন্ধ ক'রে দিলো পৃথিবীর মুখের ওপর। অরুণার পরনে একখানা চাঁপারঙের রেশমী শাড়ী, টুকটুকে লাল পাড়-তোলা—অশোক নিজেই বুদ্ধি ক'রে কিনেছিলো এখানা। অরুণা খুলে দিলো চুল, হোটেলের চায়ের প্লেটে মালা রাখলো, হোটেলের গেলাসে বসালো তোড়াগুলো। ঘরের কোণে জ্বালালো ধূপকাঠি। একটু পরে ঘরের হাওয়া নিবিড় হ'য়ে উঠলো ফুলের গন্ধে আর ধূপের গন্ধে। অশোক সিগারেট ধরাতে যাচ্ছিলো, অরুণা বললে, 'ওটা এখন থাক, এখানে একটু।'

অশোক দেশলাইটা দু'আঙুলে ধ'রে অরুণার দিকে তাকালো।

'এসো, এখানে' অরুণা বললে।

আর তারপর, হোটেলের সরু খাটে অশোকের পাশে ব'সে হঠাৎ থরথর ক'রে কেঁপে উঠলো অরুণা, যেমন ক'রে কচি পাতার গাছ কেঁপে পঠে ঝড়ের মুখে, তারপর তার ভিতর থেকে ঠেলে উঠলো কান্না, মুখ থুবড়ে লুটিয়ে প'ড়ে ঝরঝর ক'রে কাঁদতে লাগলো সে, কাঁদতে-কাঁদতে বলতে লাগলো, 'মা, মা-গো, মা—বাবা-বাবা!'

কান্না—আর কান্না—আর অশোক ব'সে রইলো স্তব্ধ হ'য়ে, ভুলে গেলো সিগারেট ধরাতে।

* * *

'কাল আমরা রেজিস্ট্রি ক'রে বিয়ে করেছি, ভালো আছি। আমাদের জন্য কোনোরকম চিন্তা করো না'। ইতি—

অরুণা।'

হৃষীকেশবাবু আপিশ-ঘরে ব'সে চিঠিটা পড়লেন। এক লাইনের চিঠি, তবু সেটুকু পড়তে এবং হৃদয়াঙ্গম করতে তাঁর যেন অনেকক্ষণ লাগলো। বিজয়া প'ড়ে আছেন শোকশয্যায়, আহার-নিদ্রা ত্যাগ ক'রে। তাঁকে চিঠিটা দেখাতে হবে। 'কোনোরকম' চিন্তার দরকারই নেই! এই 'কোনোরকম'

কথাটাই ভয়ানক। চিঠিটা হাতে নিয়ে হৃষীকেশবাবু উঠে এলেন। সিঁড়ির কাছে বারান্দায় সুমন্ত্র। থমকে দাঁড়ালেন তাকে দেখে।

'ছাখো,' হৃষীকেশবাবু চিঠিটা সুমন্ত্র'র হাতে দিলেন।

কাগজটার উপর একবার চোখ বুলিয়েই সুমন্ত্র সেটা ফিরিয়ে দিল। 'যাক' হ'য়ে গেছে তাহ'লে,' নিজের অজান্তেই তার মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেলো।

মুহূর্তে হৃষীকেশবাবু যেন পাথরের মূর্তিতে পরিণত হলেন, চোখের পলক পড়ছিল না। অনেকক্ষণ পর নীচু গলায় বললেন, 'মন্ত্র, তুমি কি সব জানতে'?

'জানতুম,' কথাটা ব'লেই সুমন্ত্র বারান্দায় চলে গেল। বারান্দায় বাইরের লোকেদের বসাবার জন্য একটা কাঠের বেঞ্চি, হৃষীকেশবাবু সেখানেই ব'সে পড়লেন। চেষ্টা করলেন অন্য কথা ভাবতে। বিকেল হ'লো। এ-সময়টায় বাড়ির সামনেকার উঠোনটা পাড়ার ছেলেদের কলরবে ভ'রে ওঠে রোজ। আজ একেবারে ফাঁকা। তিনি বারণ ক'রে দিয়েছেন। পিণ্টু গেছে পাশের বাড়িতে খেলতে—না-কি আর কোথাও গেছে, কে জানে? যা চরকিবাজি শিখেছে ছেলেটা।

চুপ ক'রে রইলেন হৃষীকেশবাবু, হাতের মুঠোয় অবণার চিঠিটা শিথিলভাবে ধরা, কেন উঠে এসেছিলেন, কোথায় যাচ্ছিলেন সব ভুলে গেলেন। উঠোনে লম্বা হ'য়ে ছায়া পড়লো, আর সেই ছায়ারই মতো নিঃশব্দে টুনকি যে কখন এসে দরজার আড়ালে দাঁড়ালো, তিনি টেরও পেলেন না। টুনকি আড়াল থেকে তাকিয়ে আছে তার বাবার মুখের দিকে বড়ো-বড়ো ভীরু চোখ মেলে নিঃশব্দে। হঠাৎ কিসের একটু শব্দ হ'লো, হৃষীকেশবাবু অস্বাভাবিকভাবে চমকে উঠলেন।

'কে—কে ওখানে?' বলতে গিয়ে তাঁর গলা প্রায় ভেঙে গেলো।

টুনকি দরজার আড়াল থেকে বেরিয়ে এলো।

'ও, টুনকি!' মস্ত একটা নিশ্বাস পড়লো হৃষীকেশবাবুর। 'কী রে টুনকি, কী চাই?'

টুনকি বাবার কোল ঘেঁষে দাঁড়ালো; কথা বললো না। মেয়েটার ঝাঁকড়া চুলগুলোর মধ্যে আঙুল বুলোতে-বুলোতে হৃষীকেশবাবু ডাকলেন,

'টুনকি।'

'বাবা!' একটু পরে টুনকি আবার ডাকলো, 'বাবা!'

হৃষীকেশবাবু বললেন, 'কী করছিস রে তুই একা-একা? যা, মীরার সঙ্গে খেলা কর গে।'

টুনকি একটু চুপ করে থেকে হঠাৎ ব'লে উঠলো, 'বাবা, তুমি রাগ করো না। দিদি খুব ভালো, দিদি খুব ভালো'।

আস্তে হাত বাড়িয়ে টুনকিকে বুকের মধ্যে চেপে ধরলেন হৃষীকেশবাবু। বোবা গলায় ব'লে উঠলেন, 'আমি রাগীমানুষ, তা-তো সে জানে। সে তো জানে—তবু আমার উপর রাগ করলো কেন'?

● ● ●

দি পাইন্‌স, শিলং
১লা জুন

প্রীতিভাজনেষু,

কাল থেকে এমন বৃষ্টি হচ্ছে যে, কী বলবো! চেরাপুঞ্জির পুঞ্জভূত মেঘ দস্যু তাতারের মতো পড়েছে এসে আমাদের ঘাড়ে। মা বলেছেন, 'কোন সুখে যে মানুষ এ-সব দেশে আসে! যদি কাপড়-জামার বস্তা হ'য়েই দিন কাটাতে হ'লো, তাহ'লে আর বেঁচে সুখ কী! তাঁর গায়ে একটি ফ্লানের জ্যাকেট চড়েছে। সেটা হলো গিয়ে বস্তা। সেকেলে ছাঁটের জামা, পুরো হাতা, দেখতে অদ্ভুত—কিন্তু মন্দ না কলকাতার পাখার হাওয়ার হালকা জামা-কাপড়ে মা থাকেন ভালো, উপরন্তু কিছু হ'লেই তাঁর উৎপাত মনে হয়। আবার কোনো-কোনো লোক দেখছি জামা-কাপড় পরতে পারবে বলেই তারা পাহাড়ে আসে। আমাদের অমৃত সরকারকে নিশ্চয়ই আপনি ভুলে যাননি! 'এ-পোড়া দেশে কাপড়-চোপড় প'রেও কি ছাই সুখ আছে!' সর্বদাই এ-আপশোষ তাঁর মুখে। কিছুকাল ইউরোপের জলবায়ু সেবন ক'রে এসেছেন। বাক্স বোঝাই বণ্ড স্ট্রীটের পোশাক, ল্যাব্রাডর কোট, সীলস্কিন টুপিও নাকি বাদ পড়েনি। ভদ্রলোকের দুঃখের কথা একবার ভাবুন তো। এত ভালো-ভালো পোশাক—বছরে একটি দিন বের করতে পারেন না। দয়া হয় না।

বাবা শালমুড়ি দিয়ে 'ম্যান অ্যাণ্ড দি ইউনিভার্স' নামে এক বিরাট পুঁথি পড়ছেন। এক ফাঁকে আমি ও বইয়ের পাতা উল্টিয়ে দেখিছি। আপনাকে বলতে লজ্জা নেই, এক বর্ণও বুঝিনি। বইয়ের এ-রকম নাম শুনলেই আমি যেন অসুস্থ বোধ করতে আরম্ভ করি। নিতান্ত মূর্খ। মানুষের জীবনরূপ এই যে, বিরাট একখানা কাণ্ড এতকাল ধ'রে চ'লে আসছে, সেটা তলিয়ে দেখবার কৌতূহল কখনোই হয় না। নিজের জীবনটাকে প্রতি মুহূর্তে এত বেশী ভালো লাগে যে, তার বাইরে—কি তার আড়ালে—কী আছে না আছে, সেটা মনেই পড়ে না কখনো। আচ্ছা, আপনিই বলুন তো এ-সব জেনে কী হয়? এ-কি আমাদের বেশী সুখী হ'তে সাহায্য করে? তাছাড়া,এই জানারই বা নিশ্চয়তা কী? দেখতেই তো পাচ্ছেন, ঘন-ঘন সব বদলাচ্ছে, তবু মানুষ যে-যুগে বাস করছে, সে-যুগের সমস্ত ধারণাই অভ্রান্ত সত্য ব'লে অনায়াসে মেনে নিচ্ছে।

যাকগে, সম্প্রতি আমার খুব বেশী ভালোও লাগছে না। বর্ষাতি চড়িয়ে পাইন-সুগন্ধি পথে-পথে ঘোরা, একা ব'সে-ব'সে পেয়ালার পর পেয়ালা চা খাওয়া—বড়ো জোর টপসির সঙ্গে একটু খেলা, এ ছাড়া আর তো কিছু দেখতে পাইনে। মাঝে-মাঝে একটা কী-চাই-কী-চাই, বচন-না-পাই, মন-কেমন-রে, গাছের ভাব এসে এই বৃষ্টি-পড়া দিনগুলিকে আরো উন্মত্ত ক'রে দেয়। এখানে আমরা এসেছি আজ বেশ কিছুদিন হ'লো, কিন্তু এ-পর্যন্ত আমার একজনও 'বন্ধু' হ'লো না। আপনি তো বলেন মেয়েতে-মেয়েতে বন্ধুতা হবার পক্ষে রেলগাড়ীর কামরায় এক ঘণ্টাই যথেষ্ট। এখানে কোনো মেয়েদের মনের বিষয়ে, এমনি অনেক অসাধারণ খবর আপনার কাছ থেকে মাঝে-মাঝেই পাওয়া গেছে। এখানে কোনো মেয়ের সঙ্গে আলাপ হ'লো না-হয়, পুরুষদের অন্তরের রহস্য এমনি ক'রে উদঘাটন ক'রে সময় কাটানো যেতো। তারপর আমাদের গবেষণার ফলাফল একটি সুনিপুণ পার্শেলে পাঠিয়ে দিতুম আপনার কাছে। তাতে আপনার পুরুষ-বক্ষের কোনোখানে এতটুকু আঁচড়ও লাগতো না, এ-কথা বলবেন না।

বাজে বকছি। কিন্তু বৃষ্টিতে বন্ধ ঘরে একা ব'সে-ব'সে বাজে না-ব'কে

উপায় কী? একটা বই পর্যন্ত নেই যে পড়ি। সেবারে রাঁচী যাবার সময় বাক্স বোঝাই ক'রে বই নিয়ে গিয়েছিলুম—নির্জন অবসরে প্রাণ ভ'রে প'ড়ে নেবো ব'লে। দু'মাস পরে কলকাতায় যখন ফিরে এলাম, তখন রবীন্দ্রনাথের 'যাত্রী'র সাড়ে-তিন পৃষ্ঠা আর ভার্জিনিয়া উলফের একটি উপন্যাসের প্রথম কয়েক লাইন পড়েছি। সেই শিক্ষায় শিক্ষার্ত হ'য়ে এবারে কোনো বই-ই আনিনি—এখন দেখছেন তো অবস্থাটা। 'অভিজ্ঞতা'য় মানুষের কোনো শিক্ষাই হয় না, এই একটা শিক্ষা আমার হ'লো। প্রতি-বারের অভিজ্ঞতাই নতুন। আচ্ছা বলতে পারেন, কেন মানুষের সময় কাটে না? সময় কাটে না ব'লেই তো এত বই, গ্রামোফোন আর রেড়িও, ফুটবল আর সিনেমা। তবু কেন সময় কাটে না বলতে পারেন?

মায়া,

'পুনশ্চ—শেষের প্রশ্নটার জবাব প্রত্যাশা করি না; তাছাড়া, আপনি তো আজকাল চিঠিপত্র লেখা ছেড়েই দিয়েছেন।'

* * *

'—লারমিনি স্ট্রীট'

৪ জুন

প্রীতিভাজনেস্থ,

আপনার ওখানে মন-কেমন-করা মেঘলা দিন, আর এখানে···। খুব কবিত্ব ক'রে একটা কথা বলতে যাচ্ছিলুম, সামলে গেলুম। আপনার আগের চিঠির জবাব লিখিনি; তবু যে আপনি আরো একখানা চিঠি লিখেছেন, সেটা আপনার দয়া ছাড়া আর কিছু নয়। অবশ্য জবাব লেখা বললে ঠিক কথাটা বলাই হয় না। ব্যবসায়িক চিঠির অবিলম্বে জবাব আসার নিয়ম। সেখানে জিজ্ঞাসা আছে, সুতরাং তার উত্তরও আছে। কিন্তু আপনার আমার এ-চিঠিগুলো অবসরের ভরা জলে ছোটো-ছোটো ঢেউ, খেয়ালের হাওয়া-লাগা, এক-একটা ঝোঁকের ধাক্কায় ছলছলিয়ে ওঠে। সত্যি বলতে, ক'দিন ধ'রে সেই ঝোঁকটা ছিলো না আমার মনে; সারাদিন

ঘুমিয়ে আর পবিত্র পৈতৃক উপদেশ শুনে-শুনে কী-রকম ম'রে ছিলাম যেন। সে-অবস্থায় আপনাকে চিঠি লিখতে বসলে লেখা হ'তো, কিন্তু সেটা চিঠি হ'তো না। আমার অবস্থা বুঝে আমাকে ক্ষমা করবেন।

স্ত্রী-চরিত্র সম্বন্ধে কখনো যদি কোনো মন্তব্য ক'রে থাকি, আমার সে-ঔদ্ধত্য আপনার বিদ্রূপ-বাণে খানখান হ'য়ে গেছে। বলতে দোষ নেই, এ বিষয়ে আমি নিতান্তই অর্বাচীন, আমার সব মতামত ( শুনতে যতই 'গম্ভীর' ও 'অভিজ্ঞ' হোক ) নানা গল্প ও উপন্যাস ইত্যাদি থেকে সংগৃহীত। আর উপন্যাস পড়া বিষয়েও আপনার সমকক্ষ কোনো-কালেও আমি হ'তে পারবো না। আপনার মুখে নানা বইয়ের নাম শুনি, খুব একটা আড়ালে নিজের অযোগ্যতা চাপা দেবারই চেষ্টা করি। ব্যর্থ চেষ্টা, বলাই বাহুল্য। আমার চোখের সামনে সাক্ষাৎ মূর্তিমতি আপনি থাকতে আমি করবো মেয়েদের নিয়ে মন্তব্য! ক্ষেপেছেন নাকি!

কিন্তু সম্প্রতি আর-একটি মেয়ের হৃদয়ের রহস্য আমার কাছে ধরা প'ড়ে যাচ্ছে। ( আর-একটি বললুম, তার মানে এ নয় যে, আপনার হৃদয়ের রহস্য আমি কিছু জানি। সত্যি বলুন তো—আপনি উপন্যাস পড়তে ভালোবাসেন আর টপসিকে ভালোবাসেন, আর সুন্দর চিঠি লেখেন, এ ছাড়া আর-কিছু কি জানি আপনার সম্বন্ধে? ) কিন্তু যে-মেয়েটির কথা বলছি, তাকে বুঝতে অসাধারণ অন্তর্দৃষ্টিও লাগে না, তার বর্তমান অবস্থা একেবারেই স্ব-প্রকাশ। আমার মা-বাবার মতো যারা ইচ্ছে ক'রে অন্ধ নয়, তারা দেখেই বুঝতে পারে। এ ব্যাপারটা আমার পক্ষে ফার্স্ট হ্যাণ্ড এক্সপিরিয়েন্স, কোনো বইয়ে পড়া ঘটনা নয়, সুতরাং এটা নিয়ে কিঞ্চিৎ গর্ববোধ না ক'রে পারছি না। এর পরে বন্ধুমহলে প্রণয়-তত্ত্ব নিয়ে কোনো তর্ক উঠলে এই প্রত্যক্ষদর্শনের জোরে অথরিটি সেজে কিছু বলতে পারবো, এমন ভরসা রাখি।

তাহ'লে সমস্তটাই বলি। মেয়েটি আর কেউ নয়, আমার বোন। নাম তার অরুণা। জানি-না, তার কথা এ যাবৎ আপনাকে লিখিনি কেন! খুব ভালো মেয়ে সে, আমার বড়ো ইচ্ছে করে আপনার সঙ্গে তার আলাপ হোক। কোনোদিন হবে হয়তো। আর একটি মানুষের পরিচয় দিতে

হচ্ছে, সে আমার ছেলেবেলার বন্ধু অশোক—এ পর্যন্ত কেমন লাগছে? যেমন চৈত্রমাসে থেকে-থেকে দক্ষিণে হাওয়া বয়, তেমনি এই দু'জনের রোমান্সের হাওয়া ক্ষণে-ক্ষণে চমক লাগাচ্ছে আমাকে। এরা দু'জনে রচনা করেছে যে স্বতন্ত্র রহস্যলোক, আমি সেটা টের পাচ্ছি আভাসে, ইঙ্গিতে, হঠাৎ সুগন্ধে এটা কেমন? যেমন কিনা পাশের ঘরে ব'সে একজন সেলাইয়ের কল চালাচ্ছে আর গুনগুন গান করছে, কলের শব্দ কখনো ছাপিয়ে উঠছে গানকে, কখনো গানের নীচে কলের শব্দ চাপা পড়ছে, আবার কখনো কল আর গান দুই-ই থেমে যাচ্ছে একসঙ্গে, সেই বিরতির ফাঁকে-ফাঁকে শোনা যাচ্ছে চুড়ির টুংটাং, হঠাৎ হাওয়ায় মাঝখানকার পরদাটা একটু স'রে গেলো, দেখতে পেলুম বড়ো জোর কালো পাড়ের ক্ষণিক বাঁকা রেখা। এই রহস্যের মধুর ছবিটি দেখতে পাচ্ছি এদের মধ্যে, ভালোই লাগছে। এরা আমাকে এড়িয়ে চলে; হয়তো ভয়ও করে মনে-মনে, কিন্তু আমি যে বুঝেছি, তাও এদের বুঝতে বাকি নেই। 'চিরকুমার সভা'র বুড়ো রসিকের পার্টটা বড়ো মজার; ও'রকম কাউকে পেলে প্রণয়ীরা বেঁচে যায়। কিন্তু আমাকে ও পার্টে ঠিক মানায় না, তাই আমাকে নিঃশব্দে উদাসীনতার ভান ক'রেই থাকতে হচ্ছে। নিজে কোনোভাবে লিপ্ত না হ য়ে বাইরে থেকে প্রণয় কাহিনী অনুসরণ করা—এই ব্যাপারটা মন্দ না; এখানকার নির্জীব দিনগুলিতে তবু একটু বৈচিত্র্য এলো।

ব্যাপারটাকে এখনো খুব লঘুভাবেই দেখছি; কিন্তু মনে-মনে আমার ভয় আছে যে, শীগগির এটা সাংঘাতিক হ'য়ে উঠবে। অশোক সেনের সঙ্গে আমার বোনের জাতে মেলে না; এদিকে আমার মা-বাবা—এ বিষয়ে তাঁদের মনোভাব তো বুঝতেই পারেন। কিছুতেই হ'তে পারে না—এই হবে তাঁদের কথা। আর আশ্চর্য এই যে, তাঁরা যেটাকে অবৈধ মনে করেন, এক অতি সুখকর অন্ধ আত্মবিশ্বাসে সেটাকে অসম্ভবও মনে করেন। পাগল, এ-কি কখনো হ'তে পারে! আমার যেটা মত নয়, পৃথিবীতে সেটা ঘটতেই পারে না—কী চমৎকার পরিতৃপ্ত জীবনদর্শন, ভাবুন তো! কিন্তু শেষ পর্যন্ত কী দুঃখের, কী নিদারুণ দুঃখের। সেই নিশ্চিন্ত আত্মবিশ্বাসে

যখন আঘাত লাগে, সে-কি মানুষকে ভেঙে চুরমার ক'রে দেয় না?

আমার মা-বাবা যদি এমন ঘোরতর আত্মকেন্দ্রিক, আত্মতৃপ্ত না-হতেন তাহ'লে তাঁরা ব্যাপারটা আঁচ করতে পারতেন নিশ্চয়ই। কিন্তু ইচ্ছে ক'রে যাঁরা অন্ধ, তাঁদের নিয়ে কী হবে বলুন। একদিন তো চোখ খুলতেই হবে, তখন যুগপৎ অশ্রুবন্যা আর রোষ-বিস্ফোরণেও কিছু ফল হবে কিনা ভাবছি। আবার এও ভাবছি, অরুণা কি অতটা সইতে পারবে? শেষ পর্যন্ত এদেরই হয়তো হার হবে···ভাবতে কষ্ট হচ্ছে। মোটা কথা, যে-সংঘর্ষ আসন্ন দেখতে পাচ্ছি, তার যে-কী ফল দাঁড়াবে, ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না। তবে এটা মনে হচ্ছে যে দুঃখ ভেঙে পড়বে সকলেরই মাথায়, কী ভাবছে নিজেই জানে না। ঝিরঝির হাওয়া আসছে পাইনের মিষ্টি গন্ধ নিয়ে, মেঘ কেউ কেটে গিয়ে কী আশ্চর্য নীল আজকের আকাশ। আর চারদিকের অগাধ সৌন্দর্যের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ মায়ার বড়ো নিঃসঙ্গ মনে হ'লো নিজেকে, যেমন আর কখনো হয়নি। কে যেন তাকে কোনো কথা দিয়ে ভুলে গেছে; কখন যেন কার আসবার কথা ছিলো, আসেনি। কত পাহাড়ের বাঁকা রেখা দিগন্তে, পথে-পথে কত ঝরণার উচ্ছলতা, আকাশে কত উজ্জ্বল আলো ছায়ার খেলা চলেছে দিনে-রাত্রে—তবু কী নেই, কী যেন নেই।

* * *

একটু পরে মায়া মাথা-ঝাঁকুনি দিয়ে উঠে দাঁড়ালো। ছোট্ট শাল গায়ের উপর টেনে নিয়ে উদ্ধত ফুলের সারির ভিতর দিয়ে চললো বাড়ির ভিতরে। ন্যাকড়ার বল ফেলে টপসি দৌড় দিলে তার পিছনে-পিছনে। স্বামিনীর আগেই সে ঘরে ঢুকে পড়েছে, দখল ক'রে নিয়েছে টেবিলের তলায় কম্বলের উপর তার নিজের জায়গা। আড়মোড়া ভেঙে গোল হ'য়ে শুয়ে পড়লো টপসি, তার চোখা নাকটার দু'ইঞ্চির মধ্যে জুতোর ডগা রেখে মায়া টেবিলে ব'সে শুরু করলো চিঠি লেখা।

'আপনার এবারের চিঠি পড়ে আমার মনটা কেমন যে হ'য়ে গেছে, কী ক'রে বলি। আপনাকে ঘিরে এখন যে-রহস্য গ'ড়ে উঠেছে, এত দূর থেকে আমাকেও তা হানা দিচ্ছে যেন। আপনার বোন অরুণাকে আমি চিনি

না, কিন্তু মনে হয়, তাকে যেন চিরকাল ধ'রে চিনেছি। এমনি সংকটের মুখে কত হৃদয় ঝড়ের পাখির মতো পথ হারিয়েছে, তা-তো ইতিহাসে পড়েছি, উপন্যাসে পড়েছি। কেউ তারা ছিঁড়ে গেছে, কেউ বা হয়েছে জয়ী গল্প হিসেবে দু'টোই সমান সার্থক, কিন্তু সত্যিকারের জীবনে এ-দু'য়ে কত প্রভেদ, কী ভয়ংকর প্রভেদ। ট্র্যাজেডির গল্প বানানো এক কথা, আর নিজের জীবনে সেটা প্রত্যক্ষ করা ··ভাবতে পারি না। আমার কেবল এই কথাই বার-বার মনে হয়, কেন হয় এমন! সবই নিজের মরজি মতো চলবে, এমন আশা করা অন্যায় আবদার, তাও বুঝি—তবু এ-কথা মনে-করতে পারি না যে যত দুঃখের ঘটনা ঘটে, সেগুলি প্রায় সবই অকারণ—ইচ্ছে করলেই এড়িয়ে যাওয়া যেতো। কিন্তু ইচ্ছেটা কে করবে? দুই পক্ষ পরস্পরকে দোষ দেবে উভয় পক্ষেরই কিছু বলবার থাকবে নিশ্চয়ই। কিন্তু সত্যি-সত্যি কে দোষী, তার বিচার কে করে?

বড়ো সুন্দর রোদ উঠেছে আজ সকালবেলায়, কিন্তু চারদিকে তাকিয়ে আমার মনে হচ্ছে এর পিছনে যেন চিরকালের একটি কান্না প্রচ্ছন্ন রয়েছে। যেন একটা তীব্র বাসনা কেঁদে-কেঁদে ঘিরে যাচ্ছে, তা পূর্ণ হবে না কখনো। মানুষের জীবনে কত যে অপূর্ণতা, কত যে ব্যর্থতার ভগ্নস্তূপ! তবু—জীবনের যেটা সবচেয়ে বড়ো সার্থকতার উৎস, সেটা যদি শুকিয়ে না যায়, তাহ'লে অন্য সমস্তই কি সহ্য করা যায় না? সেখানে বঞ্চিত করা আর অন্নাভাবে হত্যা করা একই কথা!

আমার এই অসংলগ্ন কথাগুলি মার্জনা করবেন। হয়তো নির্বোধের মতো, হয়তো ছেলেমানুষের মতো আমি ভাবছি, দুঃখ না-দেয়াটা যখন এত সহজ, তখন কেন মানুষ দুঃখ দেয়, আর সেই সঙ্গে নিজেও দুঃখ পায়? এক-এক সময় আমার মনে হয়, আমরা যেন প্রতিজ্ঞাই করেছি, পরস্পরকে সুখী হ'তে দেবো না। আমি তো খুব সুখী। সত্যি কথা বলবো, এ-পর্যন্ত আমার জীবনে কোনো দুঃখরই ছায়া পড়েনি। আমার ইচ্ছে করে সকলেই আমার মতো সুখী হোক—কেন মানুষ মুখ ম্লান করবে, কেন মানুষ কাঁদবে—কাউকে ভয় করবার কি দয়া করার প্রয়োজন কেন থাকবেই? আমি জানি পৃথিবীর কত জ্ঞানী, গুণী, কত-কত শ্রেষ্ঠ মানুষ

এ-বিষয়ে চিন্তা ক'রে কোনো কূল পাননি। তাঁদের কথা আমি বুঝি না, কিন্তু বাধ্য হয়েই এটা বুঝতে হয় যে সমস্যাটা সহজ নয়। কেননা সহজ যদি হ'তো, তাহ'লে এতদিনে এটা আর সমস্যাই থাকতো না। অন্য সকলের কথা ছেড়ে দিয়ে নিজের কথাই তখন মনে হয়। যদি কোনোদিন আমার জীবনেও এমনি করুণ কোনো দুঃখ আসে···

আপনার বোধহয় মনে হচ্ছে আমি ভীরু, দুর্বল। সত্যি ভীরু আমি। দুঃখে অভ্যস্ত নই ব'লে দুঃখ সম্বন্ধে আমার দারুণ ভয়। আপনার বোনের কথা বার-বার মনে পড়ছে। যদি কোনোদিন এক সময়টি আসে, তাকে জানাবেন, দূর থেকে তার নিঃশব্দ বন্ধু তার দিকে হাত বাড়িয়ে দিচ্ছে, তার হাতের উপর হাত রেখে সে এই কথাই জানাতে চায় যে, কোনো ভয় নেই।'

মায়া।'

* * *

রাত্রে বিছানায় শুয়ে সুমন্ত্র দ্বিতীয়বার এ-চিঠি পড়লো, তারপর অনেক রাত পর্যন্ত তার ঘুম এলো না। একটি নতুন মানুষ হঠাৎ দেখা দিয়েছে তার চোখের সামনে, নাম তার মায়া। যে-মায়াকে সে কলকাতায় চিনেছে, যে-মায়ার সঙ্গে এ-ক'দিন তার পত্রবাহার, এ-চিঠি যেন তার লেখা নয়। নাগরিক বক্রোক্তি-বিনিময়ের সরস পরিহাসের ভিতর থেকে হঠাৎ এ-কে বেরিয়ে এলো? অস্বস্তির মতো লাগলো সুমন্ত্রর; কিন্তু অতি মধুর অস্বস্তি, এই ঘুম না-আসাটা যেন অদ্ভুত কোনো নেশার মতো। কী লিখবে সুমন্ত্র এ-চিঠির উত্তর? তার কি সাহস আছে? কিছু সে ভাবলে না, মনে-মনে কোনো কথা সাজাবার চেষ্টা করলে না, আলো-নেভানো ঘরের নিঃশব্দ রাত্রির মধ্যে নিস্পন্দ হ'য়ে রইলো সুমন্ত্র। আর আস্তে-আস্তে সে যেন অনুভব করলে ঘরের মধ্যে একটা অস্পষ্ট উপস্থিতি। শুক্লপক্ষের চাঁদ কখন আকাশে উঠে এসেছে, জানলা দিয়ে তাকালে চোখে পড়ে না, কিন্তু মশারীর ফাঁক দিয়ে জ্যোৎস্নার আভা এসে পড়েছে বিছানায়। সে জানেনি, সে টের পায়নি, চাঁদ কখন উঠে এসেছে আকাশে, চাঁদ কখন এসে ঢুকেছে তার ঘরের মধ্যে।

* * *

লারমিনি ষ্ট্রীট,

প্রীতিভাজনেষু, ৮ জুন, রাত্রি

'কালই আপনাকে চিঠি লিখতুম, কিন্তু কাল একটা কাণ্ডই হ'য়ে গেলো। সংক্ষেপে বলতে গেলে ঝড় শুরু হ'য়ে গেছে। প্রথমতঃ ঝাপটাটা বেশ জোরেই আসে, চমকও লাগায় বেশী—মনে হয়, বুঝি সব উড়িয়ে নিলে। কিন্তু সেটা সামলে উঠতে পারলে. ততো ভয়ংকর আর মনে হয় না।

প্রথমে একটু ভূমিকা করি। আমার বাবা হচ্ছেন ঘোরতর ইগোয়িস্ট ধরনের মানুষ, তিনি যা করেছেন, তিনি যা বুঝেছেন, তাঁর জীবনে যেটা ঘটেছে, আমাদের মতো সত্তাহীন জীবের পক্ষে সেটাই হচ্ছে মডেল। কোথায় তার কোনো ব্যতিক্রম দেখলে তিনি ক্ষেপে যান, তুচ্ছতম থেকে গুরুতর বিষয়ে অতি উচ্চস্বরে নিজের মত জাহির করা ও অন্যের উপর স্থূল জবরদস্তি করা—তাঁর পৌরুষের ধারণা হচ্ছে এই। অথচ তিনি কৃপণ নন, কঠিন নন, কোনোরকম হীনতা নেই তাঁর মধ্যে। যদি তিনি নিজের বাইরে এসে কখনো নিজেকে দেখতে পেতেন—কিন্তু যা হবার নয়, তা নিয়ে আপশোষ ক'রে লাভ কী? আমার মা নিতান্ত ভালোমানুষ। একসঙ্গে সবাইকে খুশী করবার চেষ্টায় সর্বদাই হাঁপাচ্ছেন, তাঁর অত্যধিক স্নেহ প্রায়ই অত্যাচার হ'য়ে ওঠে। এ এক অদ্ভুত রকমের স্নেহ—শরীর তুচ্ছতম সুখের জন্য কত পরিশ্রম, কিন্তু মনের দিকে তাকাবার ক্ষমতাই নেই। মা-র হয়তো ধারণা, শরীরটা সুখে থাকলেই মানুষ সুখে থাকে, খাবার সময় অকারণে বেশী-বেশী ভাত পাতে ফেলে দেয় ( ভুলের ভান ক'রে ), অত রাত্রে অতি সযত্নে হাওয়া ক'রে মশারীর চারদিক গুঁজে দেয়—এখানেই কি ভালবাসার সীমা?

অরুণার কথা তো আগেই বলেছি, কোনো হিসেবেই সে অসাধারণ নয়. কিন্তু ঘটনার চাপে অসাধারণ হ'য়ে উঠেছে। অসাধারণ তাকে হ'তেই হবে, নয়তো সে বাঁচবে না। এখন হয়েছে কী, মা-বাবা তো এক জায়গায় অরুণার বিয়ের কথাবার্তা চালিয়েছেন, আমরা কেউ কিছু জানতাম না। কাল কথা ছিলো ওকে তাঁরা 'দেখতে' আসবেন। সব ঠিকঠাক্ শুধু এই

নাটকের প্রধান পাত্রী অরুণাকেই কিছু বলা হয়নি। প্রয়োজন বোধ করেননি কেউ। কিন্তু অরুণা কিনা সোজা ব'লে বসলো, 'না'! তখন বেলা প্রায় দুপুর, কারোরই তখন স্নানাহার হয়নি—এরই মধ্যে হঠাৎ ভয়ানক একটা গোল বেধে গেলো। নীচে থেকে শুনলুম, বাবার গলার আওয়াজ বাজের মতো গুমগুম করছে। আঁচ করলুম, এতদিনের নেপথ্য-নাটক এবার উদ্‌ঘাটিত হ'লো রঙ্গমঞ্চে। এই নাটকে আমি উইংসএ লুকিয়ে বাহবা দিয়ে ক্ষান্ত হবো, না-কি নিজেও একটা পার্ট নিয়ে নেমে পড়বো, সে-বিষয়ে মনস্থির করতে খানিকক্ষণ কাটালো। আমি তখন সবে স্নান ক'রে উঠে চুপচাপ একটু বসেছি; পৃথিবীর কারো সঙ্গেই দাঙ্গা করার মতো মেজাজ তখন আমার নয়। তবু সংঘর্ষেরও একটা আকর্ষণ আছে বোধহয়; তাই সেই দৃশ্যের ক্লাইমাক্স যখন আসন্ন, এমনি সময় প্রবেশ করলেন অযাচিত অপ্রত্যাশিত সুমন্ত্রবাবু।

যে-পার্টটা করলুম, সেটা বীরের না ভীরুর, বুঝে উঠতে পারছি না। তবে এটা মনে হচ্ছে যে, পার্টটা না-নিলেও চলতো। অরুণার দিক থেকে তার কোনো দরকার ছিলো না। কিন্তু দরকার ছিলো আমার। পৃথিবীতে কত অন্যায়, কত অত্যাচার তো চারদিকে হচ্ছে, আমরা সকলেই তো সক্রিয় না হোক, নিষ্ক্রিয়ভাবে তার প্রশ্রয় দিয়ে যাচ্ছি; কিন্তু একেবারে চোখের উপর যখন অন্যায় ঘটতে দেখি, তখন থাকতে না-পারলেও প্রতিবাদ অন্তত করতেই হয়। করলুম প্রতিবাদ, তার পুরস্কার পেলুম; কিন্তু অসহায় নারীকে রক্ষা করার গর্ব জুটলো না আমার কপালে। তখনই বুঝলুম অরুণা অসহায় নয়, কারো আশ্রয়ের দরকার নেই তার—পেয়েছে, ও পেয়েছে, নিজের মধ্যে এমন শক্তি পেয়েছে, যার সঙ্গে আর-কিছুরই তুলনা হয় না। নয়তো, কী ক'রে এত সাহস হ'লো ঐটুকু মেয়ের যে, প্রতিষ্ঠিত ও পরাক্রান্ত কর্তৃত্বের রক্তচক্ষুর সামনে একবারও বুক কাঁপলো না।

ভদ্রলোকেরা ফিরে গেলেন, নাটকের প্রথম অঙ্কে যবনিকা পড়লো। বাড়ির হাওয়া যেন চাপা বিদ্যুতের টানা-হেঁচড়ায় গুম্ হ'য়ে আছে। ভালো লাগে না, পালাতে ইচ্ছে করে। অশোকের আমাদের বাড়িতে আসা বন্ধ হ'য়ে গেছে, অরুণার কানে-কানে চলছে মা'র মধুর উপদেশ-

বাণী। আমি আছি দূরে, অরুণার সঙ্গে আমার কোনো কথাও হয়নি—তবু মনে হচ্ছে—দ্বিতীয় অঙ্কের পালা শুরু হ'তে দেরী নেই, এবং সেটা যে কোন অন্তর্ধানের বাঁকা রাস্তায় ঘটবে তাও বুঝতে পারছি।

আপাততঃ এই পর্যন্ত। এখন আমার কথা যদি কিছু শুনতে চান, সে-কথা এই যে, হাঁপিয়ে উঠেছি। পালাতে পারলে বাঁচি এবার। ইতিমধ্যে এখানে দু'এক পশলা বৃষ্টি হ'য়ে গেছে, একদিন ভালো ক'রে বর্ষা নামবে আকাশ-ভরা ঘনঘটায়। কিন্তু ঈশ্বর করুন, তখন যেন আমি কলকাতায় থাকি। কলেজ খোলার আগেই প্রত্যাবর্তনের একটা লাগসই অছিলা এখনো আবিস্কার করতে পারছি না। আপনারা কবে ফিরবেন।

সুমন্ত্র।'

* * *

'দি পাইনস, শিলং

১২ জুন

'হঠাৎ ঠিক হ'য়ে গেলো শীগগিরই আমরা কলকাতায় ফিরবো, এক সপ্তাহের মধ্যেই। জুলাইয়ের প্রথম দিকে ফেরার কথা ছিলো, বাবা হঠাৎ মক্কেলের জরুরী তার পেয়ে চঞ্চল হ'য়ে উঠেছেন। আপনিও আসতে দেরী করবেন না। কলেজ খোলার আগে একদিন চিড়িয়াখানায় যাওয়া যাবে, কী বলেন? না, কি গরম হবে? না, কি বৃষ্টি হবে? তাহ'লে কোথায় যাবেন বলুন। তবে চলুন শিবপুরের বাগান, গাছে-গাছে সেখানে—কে বাঁধবে ছড়া? আপনি! কে করবে খোদাই? আমি! এতদিন পর কলকাতার কথা ভাবতে কী ভালোই লাগছে। নাকে আসছে দুপুরবেলার রাস্তার অ্যাসপ্টের গরম গন্ধ—কোথায় লাগে তার কাছে পাইনের হাওয়া।

আজ বড়ো তাড়াতাড়ি আছে, চায়ের নেমতন্ন, এখনো তার সাজ বাকি। শিলং ছাড়বার আগে আর-একটা চিঠি যেন পাই।

'মায়া।'

'পুনশ্চ——কোনোদিন অরুণার সঙ্গে দেখা হবেই, তখন তাকে বলবো—কী বলবো জানি—না, হয়তো অনেক কথাই বলবো। সে কী আসবে কলকাতায়? আর আপনি?'-

* * *

'—লারমিনি স্ট্রীট
৫ জুন'

কাল ওরা পালিয়েছে। অরুণা আর অশোক। বাবা বজ্রাহত, মা শয্যাগত। মধ্যবর্তী দূত শ্রীযুক্ত সুমন্ত্রই শুধু আছে দাঁড়িয়ে। বাড়ির একটি জিনিষও অরুণা নেয়নি—আমি ভাবছি, আজ কলকাতায় পৌঁছিয়েই অরুণা শাড়ী পাবে কোথায়। বিয়ে হবে আইনতঃ, সে-সব আয়োজন প্রস্তুত হ'য়ে আছে। যখন টের পাওয়া গেলো, তারপর থেকে এখন পর্যন্ত বাবা বাড়ির কারো সঙ্গে একটি কথাও বলেননি। নিয়মিত ক'রে যাচ্ছেন কাজ, আজ কোর্টেও গিয়েছিলেন। আর মা এখন কাঁদছেন! কষ্ট হয়, কিন্তু তাঁরাই তো ঘটালেন এটা। যত দোষই দাও, যা-ই করো, শুধু যে পরস্পরের টানে এরা নিশ্চিত দুঃখের মুখে ঝাঁপ দিতে পারলো, সেটা কি কম কথা? কী আছে এদের, যে-পৃথিবীতে মানুষে-মানুষে নেকড়ের মতো কামড়া-কামড়ি, সেখানে এরা বাঁচবে কেমন ক'রে? অশোক আমারই মতো কলেজে পড়ে, স্কলারশিপ পায়। যদি বলো এ থেকে এদের সর্বনাশ আসবে তো আসুক না। সর্বনাশ তো কত রকমেরই আছে। নিজের হৃৎপিণ্ডকে নিজের হাতে চেপে থেঁতলে দেওয়াই কি কম সর্বনাশ। আমি তো জানি যে, মনে-মনে এরা বাঁচবে, বাঁচবে এরা, বেঁচে গেলো এরা, পৌঁছলো এরা এদের সার্থকতায়। পৃথিবীর কোন সর্বনাশ এখন এদের মারতে পারবে?

অরুণার সঙ্গে শীগগিরই কলকাতায় আপনার দেখা হবে। আরো একজনের সঙ্গে দেখা হবে, সে ছড়া বাঁধতে পারে না, সেটা আগে থেকেই জানিয়ে রাখা ভালো। সে এখন এক দুঃখের ছায়াভরা বাড়িতে নিঃসঙ্গ বন্দীর মতো, কিন্তু কোন দিগন্তে বুঝি চাঁদ উঠলো, একদিন সে-কী উঠে আসবে না প্রত্যাশার আকাশ ভ'রে?

সুমন্ত্র।'

* * *

হোটেলের যে-ঘরটি অরুণা আর অশোক দখল করেছে, সেটি তেতলায়। পুবে জানলা, সে-জানলায় দাঁড়ালে চোখে পড়ে সার্কুলার রোডের

ও-অংশটা মনোরম নয়; ধুলো উড়ছে, ধোঁয়া উঠছে, দিনে দু'একবার রাস্তার উপর দিয়ে ইঞ্জিনে-টানা কুৎসিত রাবিশের গাড়ির যাওয়াই চাই। হোটেলের ঘরটি বড়ো নয়; দেওয়াল ঘেঁষে খাট, আর খাটের বরাবর একটি টেবিল, সেখানে অরুণা দু'একটা বইও রাখে, আবার দু'বেলা ওখানেই তাদের খাবার দিয়ে যায়। একটা ড্রেসিংটেবিল ছিলো উল্টো দিকের দেওয়ালে, অরুণা সেটা সরিয়ে এনেছে জানলার ধারে, আলো বেশী পাবে। ওদের কারো কিছু লেখাপড়া করতে হ'লে ঘরের একটিমাত্র চেয়ার টেনে এনে সেই আয়নার টেবিলেই বসতে হয়; আয়নায় নিজের মুখের ছবি বার-বার তপোভঙ্গ ঘটায়। অরুণা চেষ্টা করছে আয়নাটা এমনভাবে রাখতে, যাতে মুখ দেখা না যায়, কিন্তু যতবারই সে সেটাকে ঠেলে তোলে, ততবারই নেমে পড়ে ঠিক মুখের সামনে।

ঘরটাতে অসুবিধে অনেক; কিন্তু আপাততঃ ওদের দু'জনের কাছে এর চেয়ে ভালো ঘর পৃথিবীতে নেই। এ-ঘর সব [illegible] তায় ফিরবো, [illegible] তাদের। একান্তই তাদের। ইচ্ছে করলেই দরজ [illegible] করতে পারে তারা। ইচ্ছে করলেই দরজায় তালা দিয়ে যেতে পারে বেরিয়ে। আর যা-ই বলো, জানালার ধারে দাঁড়িয়ে থাকতে বড়ো ভালো লাগে। রাস্তায় কত কিছু। নোংরা, তা ঠিক ঐ ধোঁয়া-উগরানো ইস্টেশানটাও দেখতে ভালো নয়, তবু—মোটের উপর কী চমৎকার ভাবো তো সকাল থেকে চলেছে তো চলেছেই; আবার অনেক রাত্রে যদি তাকিয়ে ছাখো, খাঁ-খাঁ করছে প্রকাণ্ড চওড়া রাস্তা, ট্রাম-লাইনগুলো মাঝে-মাঝে গ্যাসের আলোয় চিকচিক করছে, একটা লোক নেই, ঐ পানের দোকানটা শুধু খোলা, হঠাৎ একটা ট্যাক্সি ছুটে গেলো খট্‌খট্‌ ক'রে। তখন অদ্ভুত লাগে।

আর ভোরবেলা যখন রোদ আসে ঘরে, একটু এসে পড়ে বিছানায় আড়া হ'য়ে—কেউ যেন অতি সূক্ষ্ম আদরে ঘুম ভাঙায় তার। খুব ভোরে অরুণার ঘুম ভেঙে যায়। এত ভোরে কখনো সে আগে ওঠেনি, কিন্তু যে -মুহূর্তে রোদটুকু এসে বিছানায় পড়ে, অরুণার পক্ষে আর যেন শুয়ে থাকা সম্ভব হয় না। তার ইচ্ছে করে অশোকও উঠুক, কিন্তু অশোক ঘুমের ঘোরেই দু'একটা কথা ব'লে আবার যে পাশ ফেরে, শিয়রে চা নিয়ে

ঠেলাঠেলি না-করলে কিছুতেই ওঠে না। ততক্ষণে অরুণা স্নান সেরে নেয়, খুব সচেতনভাবে সিঁদুর পরে, অনভ্যস্ত হাতে সিঁদুরের গুঁড়ো রোজই প্রায় নাকের ডগায় লাগে। অশোকের মুখে পাছে রোদ লাগে, জানলা দেয় ভেজিয়ে; পরিস্কার করে অ্যাশট্রে, অশোকের ধার করা দু'টো-চারটে বই গুছিয়ে রাখে—তবু হোটেলের চাকর চা নিয়ে আসে না। বেলা সেদিন সাড়ে আটটা হবে। একটু আগে তাদের চা খাওয়া হ'য়ে গেছে; অশোক সিগারেট ধরিয়ে খবরের কাগজের চাকরী খালির পাতাটা খুঁটিয়ে দেখছে, আর অরুণা চোখ বুলোচ্ছে ছবির পাতায়। একটু পরে অশোক ব'লে উঠলো, 'এই যে—পেয়েছি।'

'কী?'

'ম্যাট্রিকুলেশনের ছেলের জন্য মাস্টার দরকার—আমার চেয়ে ভালো আর কোথায় পাবে?'

'ও!' অশোক আমারই মতো

'ও বললে যে বড়ো? পছন্দ লাগলো না? কড়কড়ে পঞ্চাশ টাকা।'

'এত? অরুণা হাসলো।

'আরে তোমার জন্যেও আছে যে একটা—এটা হচ্ছে বালিগঞ্জের মৃন্ময়ী স্কুলে—মনে হয়, তোমার কথা ভেবেই বিজ্ঞাপনটা লিখেছে।'

'কই, দেখি।'

মুখ বাড়িয়ে সেই ছোটো অক্ষরের বিজ্ঞাপন সযত্নে পড়লো অরুণা। 'একটা চিঠি পাঠালে হয়!'

'পাঠালে হয়! বলো কী তুমি? এক্ষুণি নিয়ে এসো কাগজ-কলম।'

'লিখলেই হ'য়ে গেলো কিনা।'

'একটা হ'তেই হবে যে! নয়তো বাঁচবো কী ক'রে!' এই অতি কঠিন সত্যটা হাল্কা হাসির ঢঙে উচ্চারণ করলো অশোক।

অরুণাও ঠিক সেই সুরেই বললে 'না-হ'লে চলবেই না যখন, তখন হবেই।'

অশোক কাগজটা নামিয়ে রেখে বললে, 'এখানে আমরা এসেছি কতদিন হ'লো?'

'একুশ দিন।' এক মুহূর্ত দেরী না ক'রে অরুণা জবাব দিলো।

নিখুঁত হিসেব ছিলো তার মনে! যেদিন তারা ঢাকা ছেড়ে এলো, সে তারিখ কি সে জীবনে ভুলবে?

একুশ দিন—না? যা টাকা আছে, তাতে আর বড় জোর দশ দিন হোটেল খরচ চলতে পারে।'

'আমার তো মনে হয় ছোটো একটা বাসা নিলে ঢেরকম খরচ হবে।'

'না হয় সিগারেট ছেড়ে দেবো,' নিজের মনের চিন্তার অনুসরণ ক'রে অশোক বললো। এমনিও তো আমার শখের ধূমপান।' তার হাতের ফুরিয়ে আসা সিগারেটটায় শেষ টান দিয়ে এমনভাবে সেটা অ্যাসট্রের গর্তে ফেলে দিলে যেন সেটা তার জীবনের শেষ সিগারেট। একটু চুপ ক'রে থেকে বললে, 'একটা বাড়িই নেবো। বাড়ি মানে দেড়খানা ঘরের ফ্ল্যাট। তাতেই কুলিয়ে যাবে।'

'দেড়খান দিয়েই বা কি হবে,' বললে অরুণা।

দু'জনের সম্মিলিত আয় আপাততঃ যদি একশো টাকা হয়—না, একশো টাকাতে কী হবে, কলেজে তো পড়তে হবে দু'জনকেই। তারপর আস্তে-আস্তে একদিন কেষ্ট-বিষ্টু গোছের কিছু-একটা হ'য়ে না যাই, সেই হচ্ছে ভয়।'

অরুণা বললে, 'আমার আর পড়ার কী দরকার!'

পাগল! তুমিই তো হচ্ছো ভবিষ্যতের আশা। তুমি যখন মেয়ে কলেজের প্রিন্সিপাল হবে, আমি সারাদিন অফুরন্ত আলসেমি করতে পারবো, সেই আনন্দেই বেঁচে আছি।'

অরুণা ভরা চোখে অশোকের দিকে তাকিয়ে চুপ ক'রে রইলো।

খেতে পাবে কি পাবে না, তাদের এখনকার সমস্যাটা হচ্ছে এই। সরল সমস্যা, এক কথাতেই বোঝা যায়। মনে-মনে দু'জনে অতি স্পষ্ট ক'রেই বুঝতে পারছে; কিন্তু তাদের আলোচনার সুরে কখনোই বিশেষ উৎকণ্ঠা প্রকাশ পাচ্ছে না, ম'রে গেলেও একজন কোনো ভয়ের ভাব দেখাবে না, পাছে অন্যের মনে সেটা সংক্রমিত হয়। শুধু তা-ই নয়, নিজেদের মধ্যে ওরা এমন কূলে-কূলে ভরা যে, অন্য-কিছু ওদের যেন ভালো ক'রে স্পর্শ করতেই পারছে না। পারস্পরিক সংস্পর্শের উত্তাপ জীবনের সকল

ব্যাধির বিরুদ্ধে যেন এদের টিকে দিয়ে দিয়েছে। খেতে না-পাওয়াটা অতি ভয়ানক, কিন্তু তার সম্পূর্ণ ভয়াবহতা আঘাত করছে না এদের মনে। এরা যে হালকা সুরে কথা বলছে, তা খানিকটা ইচ্ছাকৃত, কিন্তু সম্পূর্ণরূপে নয়। কিছু হবেই, কিছু একটা হবেই ; সত্যি-সত্যি তারা তো আর মরতে পারে না। জীবন যখন এমন দিগন্ত থেকে দিগন্তে খুলে গেলো, তখন কি উঁকি দিতে পাবে মৃত্যুর দূত ? তা-কি হ'তে পারে ?

সুতরাং অশোক সকালবেলার চা-পানান্তিক মধুর আলস্যে আরএকটা সিগারেট ধরালো, এক মিনিট আগেকার সংকল্প ভুলে গিয়ে। ধোঁয়া বের ক'রে বললে, 'ভেবে দেখছি, একশো টাকাব কমে কিছুতেই চলবে না। সকালবেলায় তুমি কলেজে পড়বে আর দুপুব বেলায স্কুলে পড়াবে ; আমি ঘুরে-ঘুরে ট্যুশানি করবো, যে ক'টা পাবি —বন্ধুবা অনেকে আশ্বাস দিয়েছে। সারাদিন আমাদের দেখাশোনা হবাবই ফুরসৎ নেই ; কিন্তু সারাদিনের কাজের পরে সন্ধ্যায়—'

'কিন্তু রান্না ? খাওয়া ?' প্রশ্ন করলো অরুণা।

বাঃ ! তুমি আছো কোথায় ? চাকর থাকবে না আমাদের।'

আবার চাকরও।'

'ছুটির দিনে মাঝে-মাঝে তুমি চাঁদা মাছ আনিয়ে সর্ষে আর কাঁচা লঙ্কা দিয়ে এমন রাঁধবে—'

'হায় রে !' দীর্ঘশ্বাস ফেললো অরুণা।

হেরিডিটিতে যদি এতটুকুও আস্থা থাকে—' বলতে-বলতে অশোক থেমে গেলো। চেয়ে দেখলো, ম্লান হ'য়ে গেছে অরুণার মুখ। অশোকের চোখ তার উপর পড়তেই সে মুখ ফিরিয়ে নিলে। দু'জনের মধ্যে একটা অনুচ্চারিত অঙ্গীকার ছিলো—কোনো পক্ষেরই পরিবারের কথা অন্য পক্ষ কখনো উল্লেখ করবে না। বিশেষ ক'রে অরুণার মা-বাবার কথা কখনোই যেন কোনো প্রসঙ্গে না ওঠে। এতদিনের মধ্যে ওদের ভুল হয়নি একবারও যে, পৃথিবীতে ওদের আর কেউ কোথাও নেই, এ-ভান ওদের নীরন্ধ্র। আজ হঠাৎ এক অসতর্ক মুহূর্তে অশোকের মুখ দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছিল—কিন্তু শেষ মুহূর্তে নিজেকে সে সামলে নিলো। অরুণার

ফেরানো মুখের দিকে আড় চোখে তাকিয়ে সে-কী ব'লে কথাটা শেষ করবে ভেবে পেলো না। মুখ নীচু ক'রে তাকালো খবর কাগজের পাতায়।

এমন সময় দরজায় টোকা পড়লো। অশোক বললে, 'আমাদের বিনোদ এসেছে ট্যাশানির খবর নিয়ে। ভগ্নদূত হ'য়ে না-এলেই হয়।'

উঠে গিয়ে খুললো দরজা। খবর-কাগজে জড়ানো কিছু পুঁটলি-পোঁটলা নিয়ে সুমন্ত্র ঢুকলো ঘরে। অরুণা লাফিয়ে উঠে বললো, 'দাদা!'

'তাই তো মনে হচ্ছে,' সুমন্ত্র হেসে এগিয়ে এলো। 'বাঃ, ঘরটি তো বেশ। তোর চেহারা খুব ভালো হয়েছে দেখছি অরুণা।'

অরুণা অভিভূতের মতো অস্পষ্টভাবে বলল, 'কবে এলে তুমি?

'এই আজ এলাম। তারপর অশোক, কেমন আছো বলো।

'কত দেরী করলে তুমি আসতে' বললে অশোক।

'নিজের ইচ্ছায় নয়, এর আগে আসতে পারলুম না।'

দুই বন্ধু জুতো খুলে খাটের উপর উঠে বসলো, অরুণা বসলো ঘরের চেয়ারটা কাছে টেনে এনে। জিগ্যেস করলে, 'তোমার গাড়ী আজ এতই দেরীতে এলো? তোমার আর-সব জিনিষ কোথায়?'

'গাড়ী ঠিক সময়েই এসেছে' সুমন্ত্র লজ্জিতভাবে স্বীকার করলো।

'হস্টেলে জিনিসপত্র রেখে এলাম।'

'আবার হস্টেলে গিয়েছিলে!' একটু পরে অরুণা বললো, 'আমি তো কত ভোরে উঠে জানলার ধারে দাঁড়িয়েছিলুম—কই, তোমাকে তো দেখলুম না।'

সুমন্ত্র হাসলো। 'ঐ খবরের কাগজে জড়ানো কী-সব আছে ছাখ্—তোর জন্যে দিয়েছে। আমসত্ত্ব' সরভাজা, আচার—এতখানি পথ যে নিরাপদে নিয়ে এলাম, সে-কৃতিত্বটা একবার মনে ভেবে দেখিস।'

কিন্তু কে দিয়েছে বললে না। অরুণা আস্তে উঠে গিয়ে পুঁটলিগুলো খুললো। একটা বিস্কুটের টিনে ভাঁজে-ভাঁজে আমসত্ত্ব, সিগারেটের কৌটোভরা কুলের আর তেঁতুলের আচার—অরুণার যা সবচেয়ে প্রিয় —আর একটা টিনে টুকটুকে লাল কড়া পাকের সরভাজা—তা ছাড়াও

দেখা গেলো, কাগজে জড়ানো নীল রঙের ঢাকাই জামদানি শাড়ী। জিনিস্‌গুলো দেখতে দেখতে ঝাপসা হ'য়ে এলো অরুণার চোখ, তারপর দরদর ক'রে চোখের জল নামলো তার গাল বেয়ে। সে চাপতে চেষ্টা করলো না, লুকোতে চেষ্টা করলো না; নিঃশব্দে ও প্রকাশ্যে কাঁদতে লাগলো।

দু'বন্ধুকে ভান করতে হ'লো যেন সেটা লক্ষ্য করেনি। সুমন্ত্র বললে, 'ব'লে দিয়েছিলো, (কে বলেছিলে বললে না) ইচ্ছে করলে দু'একখানা খেতে পারি ষ্টীমারে। বুঝলি অরু, ইচ্ছে যে একেবারে করেনি, তাও নয়। কিন্তু কী আশ্চর্য সংযম! এমন কোথাও দেখেছিস? একবস্তা কাপড়-জামাও দিতে চেয়েছিলো—আনতে রাজি হইনি।'

অশোক বললে, 'অরুণা, তুমি করছো কী? চা কোথায়? এখনো কি হোটেলের ঐ চিনির সরবৎ খেতে হবে? তোমার ক্ষুদে স্টোভ ধরাও—সুমন্ত্র, এ বেলাটা এখানেই কাটাবে তো?'

সুমন্ত্র অলক্ষ্যে একটু ফ্যাকাশে হ'য়ে গিয়ে বললে, 'আমাকে এক্ষুনি আবার বেরোতে হবে—ও-বেলা আসবো আবার।'

'কেন, থেকে যাও না।'

'না—না, সে হয় না।' কোনো অছিলা খুঁজে না-পেয়ে সুমন্ত্র বলল, 'গোটাকয়েক জিনিস্ এখুনি-না-কিনলে আর চলছে না।'

মায়াদের বাড়ি ভবানীপুরে, যেতে অন্ততঃ আধ ঘণ্টা। দশটার মধ্যে পৌঁছতে হবে, নয়তো দেরী হ'য়ে যায়—'যেদিন কলকাতায় পৌঁছবেন, সেদিনই আসবেন কিন্তু,' শেষের চিঠিতে মায়া লিখেছিলো।

'তাহ'লে বিকেলে নিশ্চয়ই এসো। কথা আছে তোমার সঙ্গে।'

'কথা আমারও কিছু কম নেই। তবে আপাতকঃ ও-সব কথার চাইতে ঢের ভালো হবে সকালে একসঙ্গে ব'সে চা খাওয়া।' অরুণার কান্নায়-ভেজা মুখের দিকে সহজভাবে তাকিয়ে সুমন্ত্র বললো, অরুণা—চা কর একটু।'

অরুণা কান্না থামিয়ে মেঝেতে ব'সে স্টোভ ধরালো, লেগে গেলো চা তৈরী করতে। নিজেদের চায়ের সরঞ্জাম তারা কিনে নিয়েছিলো হোটেলে দু'দিন বসবাসের পরেই। ছোট্ট স্টোভ, ছোট্ট প্যান, গোটা-চারেক পেয়ালা, চিনি আর টিনের দুধ; অন্তত চায়ের জন্য কোনো হোটেল-

ওয়ালার মর্জির অধীনে থাকতে রাজী নয় অশোক সেন। চা তৈরী হ'লো, চায়ের সঙ্গে অরুণা সরভাজা পরিবেশন করলে।

অশোক হেসে বললে, 'থাক, ও-সব তোমারই জন্যে—'

'আহা—আমি রাক্ষসী কিনা! তাড়াতাড়ি না খেলে প'চে যাবে—'

'এ যুক্তিটা ভালো বটে,' বলে সুমন্ত্র সকলের আগে আস্ত একখানা তুলে মুখে দিলো। 'তুইও খা, অরুণা। আমাদের কিন্তু বিশ্বাস নেই।'

তিনজনে গল্প করতে-করতে চা খেলো। কথায় হাসি-ঠাট্টার ছড়া-ছড়ি, অরুণাও যোগ দিলে তাতে। তার গালে তখনো কান্নার দাগ লেগে রয়েছে —কিন্তু এখন তার কথা শুনে, তার হাসি শুনে কে বলবে যে একটু আগে সে এত কেঁদেছে। তারপর সুমন্ত্র হঠাৎ ঘড়ির দিকে তাকিয়ে উঠে দাঁড়ালো

'ও কী! উঠছো নাকি?'

সুমন্ত্র বন্ধুর দিকে না-তাকিয়ে বললে, 'সাড়ে ন'টা বাজলো।'

'তাতে কী হয়েছে?'

'হস্টেলের একটি ছেলেকে আবার কথা দিয়ে এসেছি—আর বোলো না, যত সব উৎপাত।' ব'লে সুমন্ত্র হঠাৎ হেসে উঠলো।

'যাবে দাদা এখন?' অরুণা সুমন্ত্রর সঙ্গে উঠে এলো দরজা পর্যন্ত।

অশোকও আসছিলো, কিন্তু শেষ মুহূর্তে র'য়ে গেলো ঘরের মধ্যেই: দু'ভাইবোনের মুখের দিকে তাকিয়ে তার মনে হ'লো তার এখন একটু দূরে থাকাই ভালো।

দরজার বাইরে সিঁড়ির মাথায় এসে সুমন্ত্র আর অরুণা একটু দাঁড়ালো সুমন্ত্র পকেট থেকে একটা খাম বের ক'রে কিছু না ব'লে অরুণার হাতে দিলে। খামটা সাদা, উপরে কিছু লেখা নেই। অরুণা খুলে দেখলো, ভিতরে একগোছা দশ টাকার নোট—অনেকগুলো। তাছাড়া আর-কিছু নেই, একটা চিঠি না, একটা কথা না।

'মা লুকিয়ে দিলেন', সুমন্ত্র নীচু গলায় বললো।

'আর?' রুদ্ধস্বরে বললো অরুণা।

'বাবা কিছু বলেননি।'

শেষ